আবু হাসান শাহরিয়ার

অর্ধসত্য

মিডিয়ার সেই একচ্ছত্রতা এখন আর নেই। ইরাকযুদ্ধে সিএনএন আর বিবিসিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল আল জাজিরা। মিডিয়ার চোর-পুলিশ খেলায় বুশ-ব্লেয়ারকে হার মানিয়েছিলেন সাদ্দামের তথ্যমন্ত্রী সায়ীদ আল সাহাফ। মিডিয়া যে চোরের সিঁদকাঠিও, সে-কথা সারা পৃথিবীই এখন জানে। চোর নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বহুলআলোচিত উপন্যাস মনোজ বসুর *নিশিকুটুম্ব*। সে-উপন্যাস নফরকেষ্ট চোরকে নিয়ে লেখা। লেখকের মতে–
" একটা চোরের কথা কেউ যদি ভালো করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়।"
যেহেতু তসলিমাকে আমি ওর সিঁদকাঠিসমেত চিনি, তসলিমার কথা লিখলেও সবার জীবনীই লেখা হয়। তসলিমার ক আত্মজীবনী। আত্মজীবনী হচ্ছে একরৈখিক আধুনিক যুগের দান। এখন বহুরৈখিক উত্তরআধুনিক যুগ চলছে। এখন লিখতে হবে সমাত্মজীবনী– ঝাঁপি খুলব একজনের, বেরিয়ে আসবে অনেকের অর্ধসত্য। জগতে যেহেতু পূর্ণসত্য বলে কিছু নেই, ঐ অর্ধ-অর্ধ সত্যগুলো নিয়েই আমাদের সামষ্টিক জীবনী।

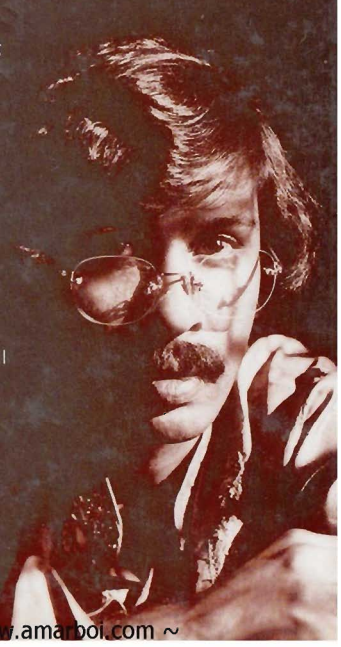

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধসত্য

আবু হাসান শাহরিয়ার সেই বিরলপ্রজ কবিদের একজন, গদ্যে-পদ্যে-সম্পাদনায় যিনি সমান পারদর্শী। বাংলা কবিতায় তিনি নতুন বাঁকের রচয়িতা। তার গদ্যও দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ। আবু হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত *খোলা জানালা* বাংলা সাহিত্যের নিকট-ইতিহাসে একটি কিংবদন্তীতুল্য ঘটনা। এদেশের অনেক দৈনিক-ই তার কাছে ঋণী। একাধিক দৈনিকের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রিন্টমিডিয়া ও দুই বাংলার সাহিত্যপাড়ার সঙ্গে তার তিন দশকের সংশ্লিষ্টতা ছোটকাগজকর্মীদের সঙ্গেও আছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত থেকে আরেক প্রত্যন্তে ছুটে বেড়ান তিনি প্রান্তিক সংগঠনগুলোর ডাকে। সেইসব সংগঠনের সদস্যদের কাছে তিনি বাতিঘরের মতো অনিবার্য। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান থেকে শুরু করে নবীনতম অনেক কবি-লেখকের সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে। বিতর্কিত লেখক তসলিমা নাসরিনের সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল একসময় তসলিমাসহ অনেক বিখ্যাতই তার হাত ধরে উঠে এসেছেন পাঠকদের কাছে। মিডিয়া ও সাহিত্যপাড়ার অনেক হাঁড়ির খবরই তার জানা উচ্ছিষ্টজীবী বুদ্ধিজীবীদেরও ভালো করে চেনেন *অর্ধসত্য* তার আত্মদর্শন। আত্মজিজ্ঞাসাও বটে।

উত্তরআধুনিক ননফিকশনধর্মী এই বই বাংলা গদ্যে এক নতুন বাঁকের সূচক। সমকালীন *সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনৈতিক* ইতিহাসের দলিলও এই বই। কোনও দল বা গোষ্ঠীর হয়ে কথা বলেন না আবু হাসান শাহরিয়ার– অগণন সাধারণের প্রতিই তার নিরঙ্কুশ পক্ষপাত। প্রচল সংস্কারগুলোকে তো বটেই, নিজেকেও তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করতে ছাড়েন না। যুক্তি–তক্ক–গপ্পে *সাবলীল* এগিয়ে যান পাঠকদের নিয়ে– পৌঁছে দেন এক নতুন ভাবনা-বলয়ে। আর তাই আবু হাসান শাহরিয়ারের বই মানেই একটি *দূরস্থায়ী* বই– আজ ও আগামীকালের পাঠকদের জন্য লেখা। *অর্ধসত্য* তেমনকম একটি বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

আবু হাসান শাহরিয়ার

জন্ম : ২৫ জুন ১৯৫৯, রাজশাহী, বাংলাদেশ

পৈতৃকবাস : কড্ডাকৃষ্ণপুর, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক...ঢাকা সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক .... ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ১ বছর অধ্যয়ন...(ছেদ)... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে ৩ বছর অধ্যয়ন... (বিচ্ছেদ)

পেশা : সাংবাদিকতা [প্রতিষ্ঠাকালীন *আজকের কাগজ*-এ সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা করতেন। দৈনিক *মুক্তকণ্ঠ*র বহুল আলোচিত সাহিত্য সাময়িকী *খোলা জানালা*র সম্পাদক। পরে এই *খোলা জানালা* কিছুদিন সার্বভৌম সাহিত্যপত্র হিসেবেও প্রকাশিত হয়। এর পর প্রতিষ্ঠাকালীন দৈনিক *যুগান্তরে* কিছুদিন ফিচার-সম্পাদক এবং দৈনিক *আজকের কাগজে* উপ-উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। *ল্যাব এইড* গ্রুপেও ১ বছর মিডিয়া কনসাল্টেন্ট ছিলেন]

নেশা : নৌকায় নদীতীরবর্তী জনপদে ঘুরে বেড়ানো।

প্রকাশনা

কবিতা : অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ, অব্যর্থ আঙুল, তোমার কাছে যাই না তবে যাব, একলব্যের পুনরুত্থান, নিরন্তরের *ষষ্ঠীপদী*, এবছর পাখিবন্যা হবে, ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সে থাকে বিস্তর মনে বিশদ পরানে, তোমাদের কাচের শহরে, আবু হাসান শাহরিয়ারের প্রেমের কবিতা

প্রবন্ধ: কালের কবিতা কালান্তরের কবিতা, কবিতার প্রান্তকথা, বহুর পৃথিবী একার সন্ন্যাস, কবিতা অকবিতা ও অল্পকবিতা

ছোটগল্প: আসমানী সাবান

কিশোর-কবিতা : পায়ে নূপুর, ভরদুপুরে অনেক দূরে, আয়রে আমার ছেলেবেলা

বিবিধ: উদোরপিণ্ডি, শুধু তোমার জন্য

সম্পাদনা : জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র, জীবনানন্দ দাশ : মূল্যায়ন ও পাঠোদ্ধার, প্রামাণ্য শামসুর রাহমান, দেশপ্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা, ছোটগল্প ৯৮, কবিদের লেখা প্রেমপত্র, ৩২ নম্বর : চোখের আলোয় দেখেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ র্ধ স ত্য

আ বু হা সা ন শা হ রি য়া র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধসত্য

আবু হাসান শাহরিয়ার

সাহিত্য বিকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক
ফজলুর রহমান
সাহিত্য বিকাশ
৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮-১২২৯১৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ
মানবেন্দ্র সুর

লেখক-প্রতিকৃতি
নাসির আলী মামুন

অক্ষরবিন্যাস
কালজয়ী কম্পিউটার্স
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তল)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
সুপার গ্রীন প্রেস
৬৮/৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২৫ টাকা

Ardhoshotto
[A Nonfiction by Abu Hasan Shahriar]
Published by : Fazlur Rahman, Shahittya Bikash
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Taka 125.00
US $: 7

ISBN : 984-8320-42-3
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

রণজিত কুমার

কুসুমকুমারী দেবীর সেই কাজে-বড় ছেলেটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Great minds discuss ideas.
Average minds discuss events.
Small minds discuss people.
–Eleanor Roosevelt

স্লেটে-লেখা নাম আমি মুছে যেতে আসি

আগস্ট ২০০৩। একটি হবু দৈনিকের হবু সম্পাদকের কাছ থেকে আইডিয়া-বিনিময়ের ডাক এল। পেছন-পেছন চাকরির অফারও। সম্পাদকের নাম নাঈমুল ইসলাম খান। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। নাঈমের সবচেয়ে বড় গুণ– ঠিক কাজের জন্য ঠিক লোকটিকে সে চেনে এবং কদর করে। বড় দোষ– সহকর্মীদের পারিশ্রমিকে ঠকায়। তবু ছেলেবেলার বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে হবু দৈনিকের মহড়াপর্বে জড়িয়ে গেলাম। এক বছর ধরেই দৈনিকটির কথা বাতাসে রটছে। হবু দৈনিকের হবু চিফ রিপোর্টার পীর হাবিবুর রহমানের সঙ্গে একদিন এ-নিয়ে একপশলা কথাও হয়েছিল শাহবাগ আজিজ মার্কেটে। পীর জানতে চেয়েছিল, হবু দৈনিকটিতে আমি যোগ দিচ্ছি কিনা। একপ্রকার না-ই করে দিয়েছিলাম তাকে সেদিন। তারপরও হবু যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হয়ে গেলাম হবু দৈনিকটির সঙ্গে। কোথাও বেশিদিন চাকরি করা আমার ধাতে সয় না। চাকরি শেষতক করি বা না করি, কিছুদিন আইডিয়া নিয়ে ব্যস্ত তো থাকা যাবে– এই ভাবনা থেকেই নাঈমের ডাকে সাড়া দিলাম।

এলেনর রুজভেল্ট আইডিয়াকে বড় মাপের মানুষের নিত্যসঙ্গী বলে জানতেন। যদিও মাপে-বড়র চেয়ে মনে-বড় মানুষ আমার বেশি পছন্দ। তবু সমাজে টিঁকতে হলে মাপেও মাঝেমধ্যে বড়র মতো ভাব দ্যাখাতে হয়। আর যে-কোনও নতুন দৈনিকের সূচনাপর্বে মাপে বড় দ্যাখানোর সুযোগ আছে। নাঈম তো 'সেই নাঈমুল ইসলাম খান' স্লোগান সম্বলিত বিজ্ঞাপনই দেয় পত্রিকায়। লিফলেটও বিলি করে। অতএব আমিও 'সেই সেই' ভাব নিয়ে যুক্ত হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে। এর আগে আরও তিনটি দৈনিকের সূচনাপর্বে কাজ করেছি– *আজকের কাগজ*, *মুক্তকণ্ঠ* ও *যুগান্তর*। 'সেই *আজকের কাগজ*', 'সেই *মুক্তকণ্ঠ*' আর 'সেই *যুগান্তরে*'র গল্পে-গল্পে আমি ছোটকাগজের মতো সাহসী এক বিকল্প দৈনিকের ভাবনা নাঈমের মাথায় চারিয়ে দিলাম। ওরও মনে পড়ে গেল, গত শতকের নয়-এর দশকের শুরুতে যে-*আজকের কাগজে*র মাধ্যমে বাংলা দৈনিকের প্রচল ধারণা পাল্টে দেওয়ার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও কেউ-কেউ তার নাম নেয়, সেই দৈনিকের অনেক আইডিয়াই সে আমার কাছ থেকে পেয়েছিল। তাই ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঘেঁটে খুঁজে বের করল *সময়* পত্রিকার কপি। আশির দশকের শুরুতে এই কাগজটিরও সম্পাদক ছিল নাঈম। *সময়* নামে একটি সংগঠনও ছিল তার পেছনে, যার ইস্তেহারটিও এতদিন পর পড়ে সে বিস্মিত– "দ্যাখো শাহরিয়ার, আজ থেকে দুই যুগ আগেই আমরা এই কথাগুলো একটু কাঁচা-মাথায় ভেবেছিলাম!"

সময়ের সেই ইস্তেহারের নিচে ছিল আমার সেই সময়ের ঠিকানা– ৩৬৫ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা। ৩৬৫ দিনে বছর বলে ঠিকানা বলার সময় আমি '১ বছর এলিফেন্ট রোড' বলতাম। তাতে মনে রাখার সুবিধা হত সবার। এই 'সব ভুলেছি'র দেশে বাস করেও নাঈম সেটা মনে রেখেছে বলে আমার ভালো লাগল।

প্রথম আলোর ডেপুটি এডিটর সাজ্জাদ শরিফের যখন চাকরি ছিল না, আমার কাছে নিয়মিত আসত। *সময়ের* বেশ পরের ঘটনা সেটা। আমি আমার বন্ধু সাদিককে বলে বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানির জনসংযোগ কর্মকর্তার চাকরিটি পাইয়ে দিয়েছিলাম সাজ্জাদকে। তো, সাদিক একদিন দুঃখ করে জানাল, সাজ্জাদকে একটা ছোট্ট শোক-সংবাদ ছাপানোর অনুরোধ করেছিল সে বছর দুই আগে– সাজ্জাদ ছাপায়নি। জনসংযোগ কর্মকর্তার সেই চাকরিটির পর আমার হাত ধরেই সাজ্জাদের সাংবাদিকতায় প্রবেশ– সেই নাঈমুল ইসলাম খানের সেই *আজকের কাগজে*। নাঈম কম টাকা অফার করায় আমি একটু বেশিই পদবী দিয়ে তা পুষিয়ে দিয়েছিলাম সাজ্জাদকে। প্রবেশমাত্রই সহকারী সম্পাদক। বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হলেও সাজ্জাদের সেই যোগ্যতা ছিল– সেই *আজকের কাগজে* আরও যারা সহকারী সম্পাদক ছিল, তাদের তুলনায় মিসফিটও ছিল না। *ভোরের কাগজের* সাবেক বার্তা সম্পাদক এবং এখন পুনর্হবু *যায় যায় দিন প্রতিদিনের* নির্মাতাদের একজন অমিত হাবিব একসময় দ্যাখা হলেই বলত, "আপনার সঙ্গে আরও আগে পরিচয় থাকলে সাংবাদিকতায় আমিও সাজ্জাদের মতো দশ বছর এগিয়ে থাকতাম। ওকে আপনি সেই কবেই এসিস্টেন্ট এডিটরের পদ দিয়েছিলেন।"– অমিতের গদ্যের হাতও ভালো। আল মাহমুদকে নিয়ে সেই *আজকের কাগজে* 'কবির আত্মপ্রতারণা' শিরোনামের একটি গদ্য লিখে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল। অমিতের অনেক কথাই মনে থাকে– সাজ্জাদের থাকে না। কারও থাকবে, কারও থাকবে না– সেটাই জগতের নিয়ম। তাই সাজ্জাদ কখনও ওর কাগজের জন্য লেখা চায় না। অনেক অযোগ্যকেই তো বাদ দিতে হয় সম্পাদকদের। ভাবি, সেরকমই অযোগ্য লেখক আমি। কিন্তু যখন ওর কাগজে বছরের ১০টি নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় নিজের বইও দেখি, তখন বুঝি, প্রকৃত কারণটা অন্যখানে– একসময় আমি সাজ্জাদ শরিফের উপকার করেছিলাম বলেই সে আমার লেখা চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগান্তর পত্রিকার প্রথম প্রচারপত্রটিও আমার লেখা। প্রথম যে-মতবিনিময় সভা দৈনিকটির সম্পাদক গোলাম সারওয়ার করেছিলেন নেত্রকোণা প্রেস ক্লাবে, তার উদ্যোগও আমিই নিয়েছিলাম। যে ভাড়া-মাইক্রোবাসে আমরা নেত্রকোণায় গিয়েছিলাম, তার ব্যবস্থাও করেছিলাম পাড়ার রেন্ট এ কার থেকে। ঐ পত্রিকার 'স্বজন সমাবেশ', 'একদিন প্রতিদিন', 'অলোর নাচন'সহ বিভিন্ন ফিচার বিভাগের নাম আমারই দেওয়া। সূচনা সংখ্যাটিও আমার সম্পাদিত। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ঐ কাগজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত 'এ জীবনের মধুর যত ভুলগুলি' নামে একটি ধারাবাহিক গদ্য লিখেছেন। শ্যামলকে *যুগান্তরে* সেই গদ্যটি দিতেও রাজি করিয়েছিলাম আমি। বাংলাদেশের অনেক লেখক-সাংবাদিকের নাম জানলেও গোলাম সারওয়ার নামের কাউকে শ্যামল চিনতেন না। রাইটার্স ক্লাবের সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় এলে শ্যামলকে আমি *যুগান্তর* অফিসে নিয়ে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। *কথকতার* সম্পাদক জামিল আখতার বীনুও শ্যামলের সঙ্গে ছিলেন। তো, স্বেচ্ছায় *যুগান্তর* ছেড়ে আসার সময় গোলাম সারওয়ার আমাকে একটি উচ্ছ্বাসপত্র (প্রশংসাপত্র) দিলেও নিজের কাগজে তিনি আমার নামটি পর্যন্ত ছাপার অযোগ্য মনে করেন। আবুবকর সিদ্দিক একবার আমাকে চিঠিতে জানানও সেকথা– *যুগান্তরে* প্রকাশিত তার একটি গদ্যে আমার একটি নিরীহ প্রসঙ্গ থাকলেও পত্রিকাটি নাকি তা বাদ দিয়ে ছেপেছে। গোলাম সারওয়ার ভুলে গেলেও দৈনিকটির কেউ-নন আবেদ খান অনেক কথাই মনে রাখেন– '*যুগান্তরের* ফিফটি পার্সেন্ট আর্কিটেক্ট' বলে নবাবগঞ্জের এক কোটিপতি নূর আলীর সঙ্গে একসন্ধ্যায় আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

AMARBOI.COM

আবেদ খানের মতো স্মৃতিধর মানুষ দেখলে আমি কিছুটা বিস্মিতই হই। *সময়ের* কথা স্মরণ করে নাঈমও বিস্মিত করল আমাকে। আর আমারও তখন ইচ্ছে হল, কৃতজ্ঞচিত্তে গোলাম সারওয়ারকেই স্মরণ করতে। সবাই এক হলে জগতের চলে না। সারওয়ারের সঙ্গেই আমি প্রথম তেরো নদীর দেশ বরিশালে যাই– জীবনানন্দের বাড়ি আর ধানসিড়ি নদীর সঙ্গে বিশদ সময় কাটিয়ে দুদিন পর ঢাকায় ফিরি। তো, ঐ ব্যস্ত সময়ে দুদিনের ছুটি সম্পাদক গোলাম সারওয়ার না-ও মঞ্জুর করতে পারতেন। ছুটিই শুধু মঞ্জুর করেননি তিনি, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকাও সেধেছিলেন। জীবনানন্দকে আমি অন্যের টাকায় কিনতে চাইনি বলে সেই টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সারওয়ারের এই বড় দিকটির কথা আমি বড়মুখ করেই নাঈমকে বলি। পাশে বসে পীর হাবিবও সায় দেয় আমার কথায়।

সবাই ভুলোমন হলে পৃথিবীতে পূর্ণমিথ্যারই জয় হত। তাই যেখানে যত অর্ধসত্য আছে, হাতড়াতে-হাতড়াতে আহসান হাবীবকে পেয়ে যাই। *দৈনিক বাংলার* চারতলায় তার ছোট্ট ঘরটি ছিল তরুণ কবি-লেখকদের প্রকৃত প্রতিভা বিকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্র। তিনি ছিলেন গুণবিচারী সাহিত্য সম্পাদক। আজকের অনেক নামি কবি-লেখককে তিনিই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমারও অনেক গল্প আর কবিতা ছাপা হয়েছে তার হাত দিয়ে। তিনি ছাপিয়েছেন বলেই অন্য সম্পাদকদেরও নজরে পড়েছি। সাহিত্যর ভুবনে কেউ না কেউ থাকেনই, যাদের কারণে যোগ্য আর অযোগ্যের ফারাকটা বোঝা যায়। অর্ধসত্য আর পূর্ণমিথ্যার ফারাক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুও ছিলেন গুণবিচারী সম্পাদক, যার হাত দিয়ে তরুণ বয়সে একটি লেখা ছাপা হওয়ার জন্য এখনও গর্ব করেন শামসুর রাহমান। আহসান হাবীব ছিলেন আমাদের তারুণ্যের বুদ্ধদেব বসু। মানিক বন্দোপাধ্যায় *লেখকের কথায়* লিখেছেন– পৃথিবীতে চেনা দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। অনেক-অনেক প্রতিভাবান তরুণকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেব বসু আর আহসান হাবীবের কাছে বাংলা সাহিত্য ঋণী। আমি যখন *মুক্তকণ্ঠের* ৮ পাতার সাহিত্য সাময়িকী *খোলা জানালা* সম্পাদনা করি, তখন এই দুই মহান সম্পাদককেই বাতিঘর জেনেছি। সাময়িকীটি শুক্রবার ছাপা হত। ঐদিন ১০/১২ হাজার কপি বেশি চলত কাগজটি। *মুক্তকণ্ঠের* সম্পাদক, প্রকাশক ও ম্যাগাজিন এডিটর কে জি মুস্তাফা, ইকবাল আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান প্রশ্রয় না-দিলে আমার সাধ্য ছিল না ঐরকম একটা সাময়িকী করার। *খোলা জানালা* সম্পাদনার জন্য কেউ আমার প্রশংসা করলেই আমি এই তিনজন মানুষকে স্মরণ করি। পরে এই *খোলা জানালাই* আমি নতুন ডিক্লারেশনে করার চেষ্টা করে দেখেছি– কত মূল্য ছিল সেই প্রশ্রয়ের। ৫টির বেশি বেরয়নি সেই স্বাধীন-সার্বভৌম *খোলা জানালা*। এর আগে-পরে আমার ওপর হিংসার বিষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িছিল প্রচারলিপ্সু আর অযোগ্যরা। যাদের আমি যৎসামান্য উপকার করার চেষ্টা করেছি একসময়, তাদেরও কেউ-কেউ আমার নামে কুৎসা রটিয়েছেন।

কিন্তু সবাই অকৃতজ্ঞ হলে জীবনের গতি থেমে যেত। তাই জীবনে একবারের বেশি যাকে চোখেই দেখিনি, সেই শঙ্খ ঘোষ আমার দুঃসময়ে চিঠি লিখে আমাকে উৎসাহিত করেন। বলেন– "এই কাজের মধ্যে থেকে আপনাকে অনেক ঘূর্ণির মধ্যে পড়তে হবে। সেটা অনিবার্য জানবেন। অযোগ্যের আস্ফালন, প্রচারলিপ্সুর আক্রমণ, উপকৃতের কৃতঘ্নতা : এই হয়তো প্রাপ্য হবে। এসব সহ্য করে থাকবার শক্তি আপনার হোক, আশা করে থাকব এটাও।" গ্রাফিক ডিজাইনার মানবেন্দ্র সুর কলকাতা থেকে হাতে-হাতে এনে দেয় সেই চিঠি। সে-ও যুক্ত ছিল সার্বভৌম *খোলা জানালার* সঙ্গে। কৃতঘ্নদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ আমাকে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথাই মনে করিয়ে দেন। আর আমিও তার চিঠি হাতে নিয়ে স্মরণ করি *দৈনিক বাংলার সাতভাই চম্পার* আফলাতুনকে, যার কাছ থেকে আমরা একসময় শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ গদ্য লেখার অনেক পাঠ পেয়েছিলাম সেই সাতের দশকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

A1/6 শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
৬৪/১ গোলাবাড়ি রোড
কলিকাতা 700 054

শ্রীচিত্তরঞ্জনেষু,

আপনার চিঠি, বই এবং পুষ্পস্তবকটি পেলাম। সত্যি নয়, অত্যুক্তি-মাখানোও নয়, আমি হতে আপনি দিয়েছিলেন বলেই তাড়াতাড়ি করে দিয়ে নেবেন। এই চিঠিও যদি সঙ্গে দিয়ে দেবেন, এইরকম ইচ্ছে দিয়েছিলেন।

আপনাদের 'খেলা ঘরানা' ক্রমশই সাংস্কৃতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে জেনে ভালো লাগল। যে-প্রস্তুতিগুলি পাঠিয়েছেন তার উন্নতি এইসঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

কিন্তু এবারই পাঠাতে পারছি না কবিতা। এটা ঠিকমত করে তুলতে আমার অনেক অসুবিধে হয়। এটা যে কারণে যে পড়াশোনাটাই কিছুদিন ধরে পাচ্ছি আমি। আমাদের পড়া-না, পথের একটিমাত্র লেখার দিকে থাকে, সেই সময়টাতেই শুধু কবিতা তা দিয়ে দেওয়া যায়। যদিও এই প্রস্তুতির সময়ে নয় তবে অন্যান্য আমাদেরই বোঝাতে হচ্ছে, আমাদেরও 'না' বলতে হলো।

কিন্তু পথের লেখার জন্যে এত দিনের ছুটিতে পারছেন যে এই 'না' বলাটাও একটা অভ্যাসের মধ্যে আছে, একটা ভাব পাবার দিকে আছে। শুধু উপলব্ধিটা নেওয়ার জন্য?

পরিবারটি সর্বাঙ্গে সমৃদ্ধ হোক, এই আমার চাওয়া থাকল। এই সময়ে দেশ থেকে সবকিছু আমার অনেক দূরেই পড়ে থাকে। যেমন ঘটনাবলী, কারণেই। আমাদের অবস্থান, সুবিধাবাদীদের অবস্থান, উভয়কেই চিনতে পারা। এই দেখা দিয়ে হয়। এমন সময় কাজ থাকবার সঙ্গে আমাদের দেখা, আমার কাছে থাকে এটাও। শুভেচ্ছা জানাবেন।

২৫ ১১৯৯

শঙ্খ ঘোষ

মানবেন্দ্র সুরের হাতে পাঠানো শঙ্খ ঘোষের চিঠি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৪ সালে আহসান হাবীবের সঙ্গে কবির বড় মগবাজারের বাসায়। বাঁ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় জন মনিরা কায়েস ও নাজমা ভাবী এবং ডানে আহসান হাবীবের স্ত্রী খাতুন সুফিয়া

১৯৮৫ সালে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে কবির কলকাতার বাসায়। বাঁয়ে নাসির আলী মামুন·

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Utpal Kumar Basu Flat 10 A/1 18/3 Gariahat Road Kolkata 700019 India
Phone 2440 9165 e-mail utpalkb03@vsnl.net

ভাই হেমন্ত শাহিদ,

6.8.2003

সুজনেষু,

এতগুলি সুন্দর বই উপহার পেয়ে
খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছি।
চমৎকার উদ্যোগ এবং প্রশংসনীয় পরিকল্পনা।

আমাদের প্রতিটি মেলে কেউ গেলে
বইপত্র পাঠাবো।

খুব ভাল হবে। ঠিকানাটা, ই-মেলে
বা ফ্যাক্সে। ইতি

শুভেচ্ছান্তে

উৎপলকুমার বসু

শাহেদ কায়েসের হাতে পাঠানো উৎপলকুমার বসুর চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫/১/১ ঈশ্বরচন্দ্র বসু লেন
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪
৫ জানুয়ারি ২০০৩

প্রীতিভাজনেষু,

শাহেদ কায়েসের হাতে পাঠানো তোমার চিঠি এবং তোমার পাঁচ-পাঁচখানি বই প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পৌঁছেছে। নতুন বই পেলে আনন্দ তো-অবশ্য হয়ে — স্কুলদিনের — প্রথম ও চিত্ত সে-রকমই হয়, তবে এই মুহূর্তে তেমন অবস্থা নেই।

সুচিত্র-সংকলনের অভাব একটি লেখার অনুবাদ করেছিলাম বলে অর্থাৎ সাহিত্যের লেখা নয়ে নেই। এমনিতে দুটি সপ্তাহের দুটুকু সুস্থ বোধ না হলেও অনুবাদটুকু তো শেষ নেই, কাজেই অনুষ্ঠানটি এড়ানোর ইত্যাদিকার জন্য একেবারে ছাড়ে হলে অনেকটা বেশ সময় নষ্ট হয়ে যায়। বেরোবার না এবার যে ঘরে আছি এই বাসাটি খুঁজেছিলেন, সেটাই আমাদের। কলকাতায় অসহনীয় ভেতরটুকু এখন প্রায় শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি প্রাণবন্ত এই-মফস্বলটাকে থেকে নিতে পারি যে এখানেও একটি লেখার সেখানে আছে।

এখানে অবশ্য অর্থের অভাব। তবে সাহিত্যের ভিতরটাই থেকে এখন বাসনাকে নয় করে আনতে পারব, সুস্থিরই হলাম। 'কৃত্তিবাস' এবং 'কবিতাসংবাদ' এবং কাছে ধুলোবালি জমা হয়ে আছে।

চাকরি যদি কখনো আসন্ন হয়, এখন কবি দেখা হবে। আগেকার অসময়ে থেকে এই চিঠি লিখছি, অসময়ে। এখনো উৎসাহ এবং ভালোবাসা জানাবে।

শঙ্খ ঘোষ

শাহেদ কায়েসের হাতে পাঠানো শঙ্খ ঘোষের চিঠি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝামাঝি সময়। অথচ যোগ্য এই মানুষটির কদর হয়নি আমাদের মিডিয়ায়। শুনেছি, তিনি দৈনিক *জনকণ্ঠে* একটা কাজ পেয়েছেন অনেকবছর বেকার থাকার পর। ধন্যবাদ তোয়াব খানকে।

বামনের দেশে উচ্চতাই যোগ্যের একমাত্র অপরাধ। তাই শুধু আফলাতুনকেই নয়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো মহান লেখককেও লোকে প্রাপ্যের অর্ধেক চেনে না। চেনে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদদের মতো প্রচারপটুদের– মুখে 'আলোকিত মানুষে'র স্লোগান দিলেও যারা এক ছটাক প্রচারের আশায় অন্ধকার মানুষদের ফ্যাশন প্যারেডে মডেল হতেও লজ্জা পান না। ভানসর্বস্ব বুদ্ধির ঢেঁকিদের মিডিয়াকাতরতায় যখন ভালো কিছু করার ইচ্ছেই মন থেকে মুছে যেতে নেয়, তখন আবারও শঙ্খ ঘোষ পরিত্রাতার মতো অভয় দেন। শাহেদ কায়েস কলকাতায় যাচ্ছে শুনে তার হাতে শঙ্খর জন্য নিজের দুটি কাব্যগ্রন্থ ও তিনটি সম্পাদিত বই পাঠিয়েছিলাম। সম্পাদিত বইগুলোর একটিতে শঙ্খ ঘোষের একটি গদ্যও সূচিবদ্ধ করেছিলাম তার অনুমোদন ছাড়াই। তার জন্য মার্জনা চেয়ে লেখা একটি চিঠিও দিয়েছিলাম শাহেদের হাতে-হাতে। বাকি দুটি সম্পাদিত বইয়ের একটি *জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র*, অন্যটি একই কবির *রূপসী বাংলা*। বই দুটিতে আমি জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে কবিকৃত সর্বশেষ সংশোধনের নৈকট্য দিয়েছি। পরন্তু মূল পাণ্ডুলিপির অনুসরণে *রূপসী বাংলাকে* ফিরিয়ে দিয়েছি তার মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা। ইতিমধ্যেই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে *জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতাসমগ্র* সহায়ক-গ্রন্থ হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। একবছর হয় বেরিয়েছে এই সমগ্র। সৌজন্যের প্রথম কপিটিই আমি শামসুর রাহমানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। জীবনানন্দের ঋণভূমে দাঁড়িয়ে শামসুরের কাব্যজীবনের শুরু। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* সেই সাক্ষ্যই দেয়। তাই ভেবেছিলাম, লেখায় না-হোক, মুখে অন্তত পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানাবেন শামসুর রাহমান। সে-দুরাশা আমার এখনও পূর্ণ হয়নি। না হোক। কাজ যদি কাজের মতো হয়, কেউ না কেউ একদিন তার কাছে এগিয়ে আসবেই। একবছর তো কোনও সময়ই নয়। এই এক বছরে অনু হোসেন সম্পাদিত *ভোরের কাগজ সমায়িকী*তেই শুধু বইটির পূর্ণাঙ্গ একটি রিভিউ বেরিয়েছে– সৈকত হাবিবের লেখা। এই সময়টাতেই শাহেদের হাতে-হাতে শঙ্খর সেই চিঠি। সঙ্গে, চিঠিতে যা নেই, সেই গল্পও শাহেদের মুখে– "দুই ঘণ্টা ছিলাম শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে। আপনাকে চিঠি-লেখার সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ আপনার বইগুলোর পাতাই উল্টেছেন তিনি।" উৎপলকুমার বসুও একইরকম উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন বইগুলো পেয়ে। আর এভাবেই শামসুর রাহমানের কাছে এক অনুজের প্রত্যাশাকে পূরণ করেন শঙ্খ ঘোষ ও উৎপলকুমার বসু। অপেক্ষা করতে জানলে সবই পাওয়া যায়– এর প্রমাণ আমি একাধিকবার পেয়েছি ছোট এই জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবু দৈনিকের হবু সম্পাদক নাঈমও অন্যের প্রত্যাশাপূরণ করতে জানে।

তো, আইডিয়া নিয়ে হবু দৈনিকটির সঙ্গে যুক্ত হলেও ঢুকতে না ঢুকতেই বিস্তর ইভেন্টের মুখোমুখি হলাম। শুরু হল দৈনিকটির দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা। আজ কুমিল্লায় তো কাল ময়মনসিংহে তো পরশু নারায়ণগঞ্জে তো তরশু বরিশালে। *যুগান্তরের* প্রস্তুতিপর্বে দৈনিকটির সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে যেমন জেলায়-জেলায় ঘুরে বেরিয়েছি, নাঈমের সফরসঙ্গী হয়েও তাই করতে থাকি। সঙ্গে থাকে পীর হাবিব। সে-ও আমার মতো *যুগান্তরে* কাজ করেছে। হাসনরাজার দেশ সুনামগঞ্জের ছেলে পীর। ওর অর্ধেকটা মন রিপোর্টারের– অর্ধেকটা সুফিসাধকের। আমার মতো ওর কাছেও অনেক হাওড়-নদীর গল্প আছে। আমি যদি কিশোরগঞ্জের হাওড়ের গল্প করি তো সে-ও সুনামগঞ্জের হাওড় টেনে আনে। আমি যদি ধানসিড়ির কথা বলি তো সে-ও সুরমার। হাসন রাজার 'দ্যাখার হাওড়ে'র মিথটিও বিশদে শুনলাম ওর কাছেই। যুবক হাসন রাতের হাওড়ে নাইওরের নৌকা ঘেরাও করে অন্যের বউ তুলে নিয়ে যায় শুনে হাসনের মা নিজেই নাইওর সাজিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। মায়ের নৌকাও ঘেরাও করেছিল উচ্ছৃঙ্খল হাসন। ঘোমটা খুলে মা তার কামুক ছেলের দিকে তাকালে লজ্জায় হাসন জলের সঙ্গে মিশে যায় আর কী। সেই থেকেই ঐ হাওড়ের নাম 'দ্যাখার হাওড়'।– মমতাজউদ্‌দীন আহমদ তার চিত্রনাট্যে মিথটিকে অতিরঞ্জিত করায় কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশ করে পীর।

হাওড়-নদীর গল্প আর হবু দৈনিকের আইডিয়ায় আমার আর পীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হতে সময় লাগে না। নাঈমের সঙ্গে সেই নিবিড়তা অনেকদিনের। অতএব হবু দৈনিকের মতবিনিময় সুবাদে আমার বাংলাদেশ সফর বেশ বন্ধুপরিবেষ্টিতই হয়। সেই সঙ্গে নস্টালজিকও। গল্পে-গল্পে উঠে আসে অনেক নাম, একসময় যাদের সবার সঙ্গে সবার প্রায় প্রতিদিনই দ্যাখা হত। আলী রীয়াজ, আমানুদ্দৌলা, মঞ্জু, ফরহাদ টিটো দেশে নেই। যারা আছি, তারাও জীবিকার প্রয়োজনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছি। ঢাকায় থেকেও মুখ দ্যাখাদেখি নেই বছরের পর বছর, এমন বন্ধুর সংখ্যাই বেশি। *একুশে টিভির* কারণে আমিনুর রশীদ, মুন্নী সাহা আর জ. ই মামুনকে প্রায় রোজই দেখতে পেতাম মিনিপর্দায়। *একুশে টিভি* বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওদের সঙ্গেও আর দ্যাখা হয় না। তবে জিল্লুরকে দেখি *চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রায়*। নঈম নিজাম এখন *এটিএন*-এর বার্তা সম্পাদক। শত ব্যস্ততার পরও নঈমই শুধু মনে করে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখে।

জীবনে দ্যাখাদেখি নেই; মৃত্যুতে বন্ধুর মুখ মনে পড়ে– এমনই এক কাচের শহরে আমাদের বাস। মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে তাই মাঠের পর মাঠ খুঁজি। আগের সেই মাঠও আর নেই। সেখানে বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবের ফাঁকি নিয়ে ঘোরাঘুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরসুরিরা– ব্যাঙের ছাতার মতো এনজিওতে ছেয়ে গেছে দেশ। ম্যালেরিয়া গেছে; কিন্তু মাদ্রাসার প্রকোপ বেড়েছে। জিন্নার 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নতুন মোড়কে ফিরে এসেছে গ্রাম-গঞ্জে। ঋণখেলাপিদের নয়া সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছে কৃষকদের ভিটেমাটি। তার সঙ্গে ফুরিয়ে আসছে মাঠ-মাঠ সবুজের গল্প। তবু যা আছে এখনও, তার এক কণাও ঢাকায় নেই। দুই পাশে অনেক ধানক্ষেত, বাড়িঘর, খাল-বিল, নদী-নালা আর হাজার বছরের জনপদ পেছনে ফেলে এক শহর থেকে আরেক শহরে এসে পড়ি আমরা। তারপর, 'আরও ভালো একটি দৈনিক কেমন হওয়া উচিত' বিষয়ে নিজেরা এন্তার কথা বলি এবং পাঠকদের কথাও শুনি।

কিন্তু আইডিয়া চিরকালই একা-মাথার জিনিস। যতই সে জনতার দিকে যায়, ততই তার মৃত্যু ঘটতে থাকে। অতএব এই মতবিনিময় সভায় পীরের, আমার আর নাইমের আইডিয়াগুলো জনতার আইডিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে। এবং এই হল একটি দৈনিকের ইভেন্টফুল প্রস্তুতিপর্ব– average mind-এর লোকজনের যা পছন্দ। যদিও নাঈম ভাবে, তার কথাগুলোই গিলছে সবাই; আমি ভাবি, আমার কথাগুলো; পীর ভাবে, পীরেরগুলো; আর পাঠকরাও ভাবেন, তাদের মতামত নিয়ে না-জানি কী একটা দৈনিক বাজারে আসছে।

ঢাকায় ফিরে আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি, এরকম একটা টো টো কোম্পানির চাকরি পেলে মন্দ হত না। পইপই করে বাংলাদেশটা ঘুরে বেড়ানো যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মানে এই নয়, মাঠপাড়ে সব গল্প শেষ

এই মাঝারি মাপের মতবিনিময় সভার সুবাদেই নারায়ণগঞ্জের *শ্রুতি* সাংস্কৃতিক একাডেমি আয়োজিত উঁচু মাপের একটা সঙ্গীতসন্ধ্যা উপরি হিসেবে পেয়ে গেলাম। আলী আহমদ চুনকা পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভা+সঙ্গীতসন্ধ্যাটি ছিল হবু দৈনিক+*শ্রুতি*র যৌথ আয়োজন। মাস দুই আগেই *শ্রুতি*র যুগপূর্তি উপলক্ষে এই মিলনায়তনে এসেছিলাম। পাঠাগার চত্বরে লাকি ওসমানের গড়া কাজী নজরুল ইসলামের একটি ভাস্কর্যের মোড়ক-উন্মোচন করেছিলেন শামসুর রাহমান। লাকির নজরুলই নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রথম প্রকাশ্য-ভাস্কর্য। উন্মোচনের আগেই মৌলবাদীরা ভেঙে ফেলতে পারে, এমন একটা আশঙ্কার কারণে, রাতদিন চব্বিশ-ঘন্টা পালাক্রমে উন্মোচিতব্য ভাস্কর্যটি পাহারা দিয়েছে *শ্রুতি*র ছেলেমেয়েরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়। এরমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের 'বিরোধী'ই শুধু নয়, 'পক্ষে'র সরকারও ক্ষমতায় এসেছে। নারায়ণগঞ্জ শহরে এমন একটা সাহসের উন্মোচন কোনও সরকারের আমলেই সম্ভব হয়নি। এই খবরটি যে-কোনও জাতীয় দৈনিকে প্রথম পাতায় ছাপা হওয়ার মতো ছিল। প্রথমত : সাহসের কারণে। দ্বিতীয়ত : ভাস্কর্যটি আমাদের জাতীয় কবির। তৃতীয়ত : সমকালীন বাংলা কবিতার সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি সেই ভাস্কর্যের মোড়কউন্মোচক। না, ঢাকার কোনও কাগজই সে-খবরের তোয়াক্কা করে না। দু-তিনদিন পর কোনও-কোনও কাগজ নেহায়েতই অনুগ্রহবশত ভেতরের পাতায় এক কলাম তিন-চার ইঞ্চি জায়গা দিয়েছে।

পীর হাবিব দিয়ে বক্তৃতা পর্বের শুরু। তারপরই আমার পালা। লাকির ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ টেনেই আমি হবু দৈনিকের মতবিনিময় সভায় আমার বক্তব্য শুরু করলাম। বললাম, "আমাদের দৈনিকে সেদিনের সেই ভাস্কর্য উন্মোচনের মতো সাহসী খবরগুলো প্রথম পাতাতেই ছাপা হবে। খবর খবরই। খবরের কোনও ঢাকা-মফস্বল শ্রেণী-বিভাজন করব না আমরা।"

তারপর তাৎক্ষণিকভাবে আরও কিছু কথা বলে এবং শ্রোতাদের অন্তত প্রকাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম একমাস পরীক্ষামূলকভাবে হবু দৈনিকটি পড়ার অনুরোধ করে নাঈমকে মাইক্রোফোন ছেড়ে দিলাম। শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নাঈমও বৃহত্তর মানুষের মনের মতো একটি দৈনিকের পক্ষেই তার বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করল। এক ঘণ্টা আগেই লাকির ভাস্কর্যের পাশে একটি চাপালিশগাছের চারা রোপণ করেছে নাঈম। গাছ-লাগানোর এই পরিকল্পনাটা আমিই নাঈমের মাথায় রোপণ করেছিলাম– যেখানেই যাব আমরা মতবিনিময়ে, সেখানেই গাছ লাগিয়ে আসব; আরও একটা দৈনিকের চেয়ে আরও একটা গাছ অনেক বেশি জরুরি পৃথিবীর জন্য।

অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ শহরের পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রাবন্ধিক-শিক্ষাবিদ করুণাময় গোস্বামীও তাদের একজন। দৈনিকের ভাষারীতি ও বানানশুদ্ধতা বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলে তিনি জানালেন, "নাঈম-শাহরিয়ারকে আমি কথা দিচ্ছি, প্রকাশের প্রথম একমাস তাদের দৈনিকটি পড়ব। তাদের দৈনিক ক্ষুদ্রস্বার্থে ব্যবহৃত হবে না, এই কথায় আমি আশাবাদী। তারা তাদের কথা রাখলে আমিও দৈনিকটি নিয়মিত রাখব।"

করুণাময় গোস্বামীর কথায় দর্শক-শ্রোতাদের প্রায় সবাই একযোগে হাততালি দিলে আমাদেরও আর বুঝতে বাকি থাকে না, আজকের কোনও দৈনিকেই বৃহত্তর মানুষের স্বপ্নের প্রতিফলন নেই। রক্তশূন্যতায় মানবদেহের যে-করুণ-দশা হয়, খবরশূন্যতায় এইসময়ের দৈনিকগুলোরও সেই একই হাল। তাই আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে সাফাই-সম্পাদকীয় লিখতেও *প্রথম আলো* নামের দৈনিকটির একদা-কম্যুনিস্ট সম্পাদক মতিউর রহমানের হাত কাঁপে না। মতবিনিময় সভার পর সঙ্গীত-সন্ধ্যায় গানে-গানে সেই বেদনার কথাই প্রাণে-প্রাণে পৌঁছে দিল *শ্রুতি*র সদস্যরা। আদমজী জুটমিল বন্ধ হওয়ার ফলে অসংখ্য পরিবারের ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার করুণগাথা সেই গান। অসংখ্য স্বপ্নের মৃত্যু দিয়ে বোনা তার সুর। গীতিকার ও সুরকার দুইই নিতুপূর্ণা। তরুণ কবি হিসেবেও ইতিমধ্যে নজর কেড়েছে সে। ঢাকার বড়কাগজগুলো নিতুর মতো অমিত সম্ভাবনাদের পরিচর্যা করতে শেখেনি। কিন্তু অনাদর আর অবহেলায় প্রকৃত কবির মৃত্যু হয় না– হলভর্তি দর্শককে কাঁদিয়ে নিতুপূর্ণার গান সে-কথাই প্রমাণ করল। আর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসের ভূতও আমার কানে-কানে আমারই কবিতার তিনটি পঙ্‌ক্তি শুনিয়ে গেল–

> যারা আমার পথে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিল, তারা নিজেরাই আজ কাঁটাবিদ্ধ
> আমি তেরো নদী সাঁতরে তোমাদের কাছে এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ তিন পঙ্‌ক্তি 'কবিতা নিয়ে সন্দর্ভরচয়িতাদের জন্য কয়েকটি টীকা' শিরোনামের একটি কবিতায় আছে। জীবনানন্দের সময় মাথা-মোটা অধ্যাপকরাই ছিলেন প্রকৃত কবিদের জন্য বড় সমস্যা। তাই তিনি অধ্যাপকদের নিয়ে তার 'সমারূঢ়' কবিতাটি লিখেছিলেন। কিন্তু কবিদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন মিডিয়া। আমার ঐ কবিতায় আমি আমার কালের কথাই ধরে রেখেছি। ভবিষ্যতে যারা কবিতা নিয়ে গবেষণা করবেন, কবিতাটি তাদের উপকারে আসতে পারে।

আমার জন্য আরও একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেদিন। আদমজীর গানটি ছাড়াও *শ্রুতি*র সদস্যরা আমার 'জাহাজ ছেড়ে গেছে, জাহাজ ছেড়ে যায়, পেছনে ফেলে যায় বন্দর....' কবিতাটি সুরে-ছন্দে গেয়ে শোনাল। কবিতাটিতে সুরারোপ করেছে নিতুই। মুগ্ধ হয়ে আমি শুনছিলাম সেই গান। কবিতাটির পাল্‌স ঠিক-ঠিক ধরতে পেরেছে নিতু। যারা গাইছে, তারাও।

*শ্রুতি*র পেছনে আছেন রণজিত কুমারের মতো একজন স্বপ্নচারী মানুষ। পাশে কাজল কাননের মতো সহযোদ্ধা। ইচ্ছের জোর থাকলে সামান্য সামর্থ্যেও যে বড়-বড় স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব, তার অনেক প্রমাণ এই সংগঠন ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছে। *বিদ্যাপীঠ* নামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে *শ্রুতি*। সেখানে বস্তির ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। এই বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নও রণজিত দেখেন। সম্প্রতি সেই স্বপ্নের বীজ রোপিত হয়েছে *শ্রুতি*র নিজস্ব তহবিল থেকে কেনা ছোট্ট একখণ্ড ধানী জমিতে। আমারই ফলক-উন্মোচনের কথা ছিল সেই স্বপ্নের। কবিতার একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তখন কলকাতায় ছিলাম বলে স্বপ্নের দিনটি হাতছাড়া হয়ে যায়। পায়ে তেভাগার কাদা মেখে *শ্রুতি*র ছেলেমেয়েরা খাঁটি মানুষের মতো উপভোগ করেছিল দিনটিকে– নূপুর, মিলটন আনোয়ার আর লোপা মমতাজের কাছে পরে সেই গল্প শুনেছি। *ধাবমান* নামে একটি ছোটকাগজ এবং ছোটকাগজটির নামে একটি পাঠচক্রও আছে *শ্রুতি*র। দশ বছর ধরে বিরতিহীন চলছে তার কার্যক্রম। ৫০০তম পাঠচক্রটিও আসন্ন। বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামে বুদ্ধদেব বসুর পৈতৃকভিটায় দিনটি উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে নীরবে-নীরবে– পেলাম সেই নতুন খবরও। অনুমান করতে কষ্ট হল না, এই প্রাণের খবরটিকেও ঢাকার দৈনিকগুলো উপেক্ষা করবে। অযোগ্যের দেশে উপেক্ষাই যে যোগ্যের একমাত্র পুরস্কার, *শ্রুতি+ধাবমানের* ছেলেমেয়েরা তা জানে। জানে বলেই তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চর্যার সহস্রাব্দ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আবু কায়সার, শামসুর রাহমান ও সিকদার আমিনুল হক

*শ্রুতি*র সঙ্গীতসন্ধ্যা। ডান থেকে প্রথমজন রণজিত কুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধলেশ্বরী-ইছামতীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দিনমান কবিতাভাসান

গোল্লার গির্জায় কবিতাপাঠের আসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুৎসাহিত হয় না মিডিয়ার শীতলতায়।

হবু দৈনিকের হবু সম্পাদক নাঈম উপেক্ষা করতে পারল না *শ্রুতি*র ছেলেমেয়েদের। অনুষ্ঠান শেষ হতেই ছুটে গেল মঞ্চে। ছবি তুলল সবার সঙ্গে। বলল, "দৈনিক ছেড়ে আমার তো তোমাদের গানের দলেই ভিড়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

নাঈম তখন অন্য এক নাঈম। ভুলেই গেছে সে, এক হবু দৈনিকের মতবিনিময়ের জন্য তার নারায়ণগঞ্জে আসা। পারিশ্রমিক-প্রদানে কৃপণতা যদি নাঈমের স্বভাবের অর্ধেকটা হয়, তবে এইটুকু তার বাকি অর্ধেক। শিশুর মতো সরল এই নাঈমকেও আমি চিনি। আর সেকারণেই তার ডাক কখনও ফিরিয়ে দিতে পারি না। এক যুগ আগে *আজকের কাগজ* নামের একটি নতুন দৈনিক সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা সংবাদপত্রে নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল নাঈম। তখনও আমি তার স্বপ্নের সতীর্থ ছিলাম। তার ডাকে সাড়া দিয়ে আবারও একটি নতুন স্বপ্নের পাশে দাঁড়িয়েছি। পাশে কি সত্যিই দাঁড়িয়েছি? আমি আসলে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। কবিতার পাশে। সেই কবিতাকে নাঈমও ভালোবাসে। কবিতার জন্য তার নিজের অফিসটিও ছেড়ে দেয় চাইলে। সেখানে 'সংলাপ ও কবিতা সন্ধ্যা' শিরোনামে সিরিজ-অনুষ্ঠান করি আমরা। 'চর্যার সহস্রাব্দ' নামে জমজমাট কবিতা পাঠের আসর বসাই। শামসুর রাহমান, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, আবু কায়সার এসে তাদের জীবন ও কবিতার কথা শোনান। প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলাম নদী ও নদীতীরবর্তী জনপদের গল্প করেন। মেজর আখতার আহমেদ বীরপ্রতীক ও মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া শোনান মুক্তিযুদ্ধের বীরগাথা। সেলিম আল দীন প্রাচ্যকলা নিয়ে কথা বলেন। কবির হুমায়ূনের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানগুলো হয়। কোনও অনুষ্ঠানেরই প্রেসরিলিজ ছাপিয়ে সস্তা-প্রচারে নিজেদের নাম ভাসাই না আমরা ঢাকার তকমাআঁটা প্রচাপটুদের মতো। বরং রাজধানী ছেড়ে ধলেশ্বরী আর ইছামতীর টানে বজরা ভাসাই। অনুষ্ঠানের নাম দিই– *কবিতা ভাসান*। আবদুল্লাহপুর ঘাটে বজরা নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় থাকে আসাদ মান্নান। কবি+টিএনও। ওর পোস্টিং তখন ঢাকার নবাবগঞ্জে। ইছামতির পাড় ঘেঁষে ওর সরকারি কোয়ার্টার। আসাদের নবাবগঞ্জে আগেও দুবার গিয়েছি। নদীপাড়ে রাতজেগে পরানের পালা শুনেছি। ফিরে এসে লিখেছি– "ইছামতি ধুয়ো তোলে, পুঁথি পড়ে আসাদের বাড়ি/ পরানের পালা হবে নদীপাড়ে মানুষের ঢল।" আর ফোনে-ফোনে জানিয়েছি– "এবার দলবল নিয়ে আসছি। নাজমা ভাবীকে ৫০/৬০ জনের খিচুড়ি পাকাতে বলে তুমি আবদুল্লাহপুর ঘাটে বজরা নিয়ে চলে এসো।" ফোনের দিন-ক্ষণ অনুযায়ী আসাদ ঠিক-ঠিক বজরা নিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে বাকুম। আসাদের ছেলে। তারপর বজরায় দিনমান কবিতা। দুপুরের বিরতিতে ভাবীর রান্না করা সুস্বাদু খিচুড়ি। নদীর বাতাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে লাগলে বেশি খিদে পায়। তবু খাওয়া শর্ট পড়ে না। বিরতির পর আবার বজরায়। পানিপরিবেষ্টিত গোল্লার গির্জায় বিকেলে কবিতা পাঠ করি আমরা। সেই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে সদ্য কসোভা-ফেরত জাহিদ হায়দার। জাহিদ আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন। প্রিয় কবিদেরও। জাতিসংঘের চাকরি নিয়ে প্রায়ই দেশের বাইরে গিয়ে থাকে। যখন যে-দেশে যায়, সে-দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে চিঠি লেখে। অসামান্য সেইসব চিঠি। কোনওদিন আমাকে-লেখা চিঠিপত্রের সংকলন প্রকাশিত হলে পাঠকও সেই মহার্ঘের স্বাদ পাবেন। তো, গীর্জার লোকজনও জাহিদ পরিচালিত সেই কবিতার পাগলামিতে যোগ দেন। *বাইবেল* ভুলে কবিতাতেই যীশুকে খোঁজেন তারা। কবিদের চা-মিষ্টি খাওয়ান। চা-মিষ্টির পর আমরা আবার বজরায় চাপি। ইছামতির ঢেউয়ে ফুলের চক্র ভাসিয়ে প্রতীকে *কবিতা ভাসান* সম্পন্ন করি। নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক বাংলা কবিতা– এই আমাদের মনের বাসনা।

এই *কবিতা ভাসানে* কলকাতার মেয়ে মানসী কীর্তনিয়াও যোগ দিয়েছিল। মানসী *কারুভাষ* নামে একটি ছোটকাগজের সম্পাদক। *লোক* পত্রিকার সম্পাদক অনিকেত শামীমের অতিথি হয়ে ঢাকায় এসেছিল। মনের খুশি তার মুখেও উপচে পড়ছিল অকৃত্রিম। বার-বার বলছিল– "আমাদের কলকাতার কবিরা এত চমৎকার একটি অনুষ্ঠানের কথা কল্পনাও করতে পারবে না।"

আর আমি ভাবছিলাম– আমাদের ঢাকার কবিরা মানসীর মতো এত সুন্দর করে প্রশংসাই করতে জানে না। আয়োজকদের তারা ধন্যবাদটুকুও দিতে শেখেনি।

ভাসানের বজরায় র‍্যাফেলের ড্রও করেছিলাম আমরা। তাতে *রবীন্দ্র রচনাবলি* আর *নজরুল রচনাবলি* ছাড়াও এ-বই সে-বই ধরা পড়েছিল এ-ওর ভাগ্যের জালে। অনুষ্ঠানে যেতে না-পারলেও বইয়ের টাকা সময় মতো ঠিকই কবির হুমায়ূনের হাতে তুলে দিয়েছিল নাঈম।– কোনও হবু দৈনিক-টৈনিকে নয়, আমি আসলে এই নাঈমের পাশে দাঁড়াই। আমার ছেলেবেলার পাশে। *কবিতার সঙ্গে কথোপকথন* নামের একটি বই আমি ছেলেবেলার চার বন্ধুকে উৎসর্গ করেছি। নাঈমও তাদের একজন। আমি সেই বইয়ের উৎসর্গপত্রের পাশেই দাঁড়াই–

আজফার আজিজ
ডা. আবু শামীম
লে. কর্নেল মির্জা বাকের
নাঈমুল ইসলাম খান

কুমিল্লা জিলা স্কুল ডাকছে, যাবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং নাঈমও আমার মতো ছেলেবেলার সেই ডাক শুনতে পায় বলে ওর ডাকে সাড়া দিয়ে বার-বার পারিশ্রমিকে ঠকি। সত্যের বাকি অর্ধেক বলে– আমাকে ঠকিয়ে নাঈম নিজেই ঠকে। অন্যদিকে আমি ঠকতে-ঠকতেও কত কী পাই। আমার কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিটির মতো– 'লোকসানে যার প্রাপ্তি তাকে মেলাবে কোন হালখাতাতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিডিয়ায় পাখি নেই, মশারাই খ্যাতির শিখরে

অন্যদিকে কাজের কাজ কিছুই হয় না হবু দৈনিকটির অফিসে। সেখানে কথা হয়, কত সস্তায় সাংবাদিক কেনা যাবে এবং কত দ্রুত মুনাফা করা যাবে সেই সব বিষয়ে। বেতন নিয়ে মাছের বাজারের মতো দরাদরি চলে নাঈমের ঘরে।

নাঈমের সঙ্গে দামে পড়তা না-পড়ায় একের পর এক ভালো সংবাদকর্মী এসে ফিরে যাচ্ছেন। যে দু-চারজন ভালো আসি-আসি করছেন, তারাও এই আসি তো এই যাই। এন্তার বাজে ইভেন্টের পেছনে ব্যয় হচ্ছে 'আরও ভালো একটি দৈনিকে'র প্রস্তুতিপর্বের সময়। এইসময় হবু দৈনিকের হবু নির্বাহী সম্পাদক মারুফ চিনু একদিন জানালেন, তসলিমা নাসরিনের নতুন বই বাজারে আসছে, যেখানে নাঈমকে ভ্রূণহত্যার জন্য দায়ী করেছে তসলিমা। পীর হাবিবের টেবিল ঘিরে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে, তসলিমা নাসরিনের প্রকতাশিতব্য বইটি নিয়ে সব মনোযোগ জড়ো করি আমরা।

পীর প্রকাশকের চাচাতো ভাই। তাই তার টেবিল সম্পাদকের টেবিলের চেয়েও বড়। সেই টেবিল ঘিরে হবু দৈনিক নিয়ে প্রতিদিন অনেক জল্পনা-কল্পনা চলে। পরদিন টেবিলের ধুলোর সঙ্গে সেই সব জল্পনা-কল্পনাও মুছে দিয়ে যায় রিপোর্টিং সেকশনের পিওন। তসলিমার প্রকাশিতব্য বইটিও পরদিন মুছে যাওয়ার জন্য আমাদের সান্ধ্য আড্ডার এজেন্ডা হয়ে ওঠে।

মারুফ চিনুর কথায় নাঈমকে প্রথমে একটু বিব্রত মনে হলেও গালভরা হাসিতে সে উড়িয়ে দিতে চাইল পুরো বিষয়টিকে। নাঈম ওড়াতে চাইলে কী হবে, তসলিমা উড়ল না। অনুপস্থিত সে-ও ভারি নিতম্ব গেঁড়ে বসল আমাদের উপস্থিত আড্ডায়। বরাবরই তসলিমা পাছাভারি স্বভাবের। সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে যখন ওর লেখালেখির শুরু, সেই তখন থেকেই। খ্যাতি আর টাকা হওয়ার পর সে নিতম্বেও ভারি হয়েছে। সেই ভারি নিতম্ব নিয়েই আমাদের আড্ডায় ভর করল। জাঁক দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন থিওরির presence আর absence-এর খেলা চলতে থাকল হবু দৈনিকের হবু চিফ রিপোর্টারের টেবিল ঘিরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তসলিমাকে 'তসলিমা' বলায় নাঈম একটা মজার কথা বলল, "মিডিয়া কী-ই না পারে, নাসরিনের ডাকনামই পাল্টে দিয়েছে। শাহরিয়ারও নাসরিনকে 'তসলিমা' বলছে।"

এই সময় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাসের ভূত আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "ঠিক বলছে নাঈম, মিডিয়া সব পারে। সরদার ফজলুল করিমকে দিয়েও বলিয়ে নিতে পারে যে ম্যাক্সিম গোর্কির ক্লাসিক *মা* আর আনিসুল হকের *মা* সমানে সমান।"

হ্যাঁ, তসলিমাকে একসময় আমরা 'নাসরিন' নামেই ডাকতাম সবাই। ও নিজেও নামের শেষ অংশটাই পছন্দ করত। একটু বিরতি দিয়ে নাঈম এইসময় তার ভ্রূণহত্যার কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গর্ভপাতের প্রস্তাবটা নাসরিনের দিক থেকেই প্রথম এসেছিল, বোঝাতে চেষ্টা করল সে-কথা।

"যার কাছ থেকেই আসুক, তসলিমা তো আর কচি খুকিটি ছিল না তখন, যে, তুমি বললেই ক্লিনিকে গিয়ে ঊরু পেতে শুয়ে পড়তে হবে বেড়ে। অতএব ওরটাও অর্ধসত্য; তোমারটাও তাই।"– আমি ব্যস্ত হলাম আমার দর্শন নিয়ে।

হবু দৈনিকে ঢোকার আগ থেকেই আমি 'অর্ধসত্য' নামক আমার এই নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। দৈনিকটিতে ঢোকার পর এর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েছে। কেউ আর নিজের কথাকে পূর্ণসত্য বলে দাবি করে না; বলে– "আমার এই কথা অর্ধসত্য।" কিন্তু দর্শন উপেক্ষা করে মারুফ চিনুর ভব্য কান আমার 'ঊরু পেতে' শব্দপুঞ্জে রিঅ্যাক্ট করে বসল। মৃদু আপত্তি তুলে সেকথা জানান দিলেন তিনি। আফটার অল, তসলিমা আমাদের নাঈমের একদা-স্ত্রী।

মারুফ চিনুর কথায় নিজের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেল– 'চাষার ভাষায় যদি কথা বলি তোমাদের ভব্য কানে লাগে।' আমার কবিতায় আসা-যাওয়ার প্রতীকগুলোর একটি ঐ 'ঊরু পেতে'। কেন 'ঊরু পেতে', সেটা বোঝাতে মারুফ চিনুকে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা শোনালাম– "এখন সাইবার যুগ, ঊরু পেতে বসে আছে গোপবালিকারা/ প্রেমের রাধায় আর গোপালের মন ভরিবে না।"

অতএব 'ঊরু পেতে' নিয়ে আপত্তি দূর হল।

নাঈম ততক্ষণে 'হবু'র স্টিয়ারিঙে হাত রেখে ব্যাক গিয়ারে স্মৃতি হাঁকাতে শুরু করে দিয়েছে। কবে নাসরিনকে আমি নাঈমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, কেমন ভালো লেগেছিল তাকে প্রথমদর্শনে, কেমন কেটেছিল তার প্রণয়ের প্রথম দিনগুলো, কেমন শিক্ষা হয়েছে তার শেষতক– আইডিয়া শিকেয় তুলে এগুলোই হয়ে উঠল আলোচনার বিষয়। নাসরিনের সঙ্গে নাঈমের বিরোধের সূত্রপাত কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে, বাদ গেল না সে-কথাও।— নতুন সংসারে এসেও পুরানো রুদ্রকে ভুলতে পারেনি নাসরিন। প্রায়ই তাকে বাড়িতে ডাকত সে। একবার রুদ্র আর নাঈম দুজনের সঙ্গেই একসঙ্গে রাত কাটাতে চেয়েছিল নাসরিন। এই গ্রুপসেক্সের আব্দার নাঈম মেনে নিতে পারেনি। তারপর থেকেই মনোমালিন্য। পরিণতি— বিবাহবিচ্ছেদ। নাঈমের প্রথম; নাসরিনের দ্বিতীয়।

গোপন সিন্দুকের সবটাই ডালা খুলে নাঈম এইসব তথ্য পরিবেশন করতে শুরু করলে পীর হাবিব ছটফট করতে লাগল। পীর জাত রিপোর্টার। না-চাইতেই পাওয়া এত-এত খবর, অথচ হবু দৈনিক কবে বাজারে আসবে, তারই খবর নেই— এমন একটা উত্তেজনা-অবশতা কাজ করছে তখন ওর মধ্যে। এই সময়, আমার উদ্দেশেও এক চিমটি স্যালাইনের নুন সরবরাহ করলেন আড্ডার তসলিমা বিষয়ক বিশেষ সংবাদদাতা মারুফ চিনু, "আপনার সম্পর্কেও কিছু কথা আছে। অতএব আপনিও সাবধান।"

সাবধানতা আমার স্বভাবে নেই। তাই হাসতে-হাসতেই নিজের দর্শনে স্থির থাকলাম, "জগতের সব সত্যই অর্ধসত্য। তসলিমা যদি তার বইয়ে আমার সম্পর্কে কিছু লেখে, সেটা হবে সত্যের অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেক কোনও একদিন পাঠক আমার লেখায় পাবে। না-পেলেও কিছু যায়-আসে না। কারণ, সবই তো অর্ধসত্য।"

হবু দৈনিকের আইডিয়াগুলো কখন যে তলিয়ে যায় আমাদের তসলিমাচর্চায়, কারুরই তা মনে থাকে না। ফলে আমরাও চিন্তাশীল মানুষের বদলে নেহায়েতই গড়পরতা মানুষের মতো আচরণ করে চলি। আজকের মিডিয়াও এই আচরণই চায়। লাকি ওসমান বা নিতুপূর্ণাকে সে চেনে না। চেনার সেই চোখই তার নেই। তবু জীবনানন্দের কবিতার বিখ্যাত সেই পঙ্‌ক্তিটির মতো এই অন্ধ মিডিয়াই আজ সবচেয়ে বেশি চোখে দ্যাখে। অন্ধের তসলিমাদর্শনই আজকের মিডিয়ায় অনেক বড় খবর। কারণ মিডিয়ার আকাশে এখন আর পাখি ওড়ে না। সেখানে প্রচারপটু এডিস-মশাদের ওড়াউড়ি। এডিস-রাজনীতিবিদ, এডিস-কবি, এডিস-কলামিস্ট, এডিস-সংস্কৃতিজীবীদের নিয়েই তার কারবার। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে বলেছিও একদিন সে-কথা— 'মিডিয়ায় পাখি নেই, মশারাই খ্যাতির শিখরে।' কিন্তু কে পড়ে সেই কবিতা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃপণের মুঠি ভরা হিসেবের গোপন চালাকি

মাথার আইডিয়া মাথাতেই থাকে আমাদের। অন্যদিকে হবু দৈনিকটির trial issue প্রকাশের দিন-ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। এর একটি নামকরণও করে ফেলি চটজলদি– '*গৃহপ্রকাশ* সংখ্যা'। এই নামকরণের জন্য নাঈম আমাকে একটা চমৎকার শার্ট উপহার দেয়। *গৃহপ্রকাশ* উপলক্ষে ঢাকার এক হোটেলে সুধী-সমাবেশের সব প্রস্তুতি তখন সম্পন্ন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রকাশক+প্রধান সম্পাদক যে-লিখিত-ভাষণটি দেবেন, তা লিখে দেওয়ার ভার পড়ল আমার ওপর।

ঢুকলাম প্রকাশক+প্রধান সম্পাদকের ঘরে। নাঈম আর পীরের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বাড়ি সিলেট। বেঁটেখাটো মানুষ। মুখে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হাসি। টাকা আছে, কলমের জোর নেই। 'উহ্য' শব্দটা লিখতে গিয়ে বানানটাই হাতড়ে পাননি মাথা ঘেঁটে, এই মূর্খতার কথা এমন চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, যেন বাংলা একটা ভাষাই নয়। তার মাথাটাই যে কোনও মাথা নয়; মুদিখানার ক্যাশবাক্স– সেকথা বোধহয় কোনও তোষামোদকারী তাকে বলেনি কখনও। বললে প্রকাশক পরিচয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন; প্রধান সম্পাদক হওয়ার সাধ জাগত না মনে।

কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে *আনন্দবাজারের* রঞ্জন চ্যাটার্জির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভদ্রলোক বেশ প্রগল্‌ভতার সঙ্গে সেকথা জানালেন। ভাবখানা এমন– বাপু হে, আমি *আনন্দবাজার* জয় করে এসেছি; আমার সঙ্গে কোনও টালি-বালি চলবে না।

আমি নামটা শুধরে দিলাম– "চ্যাটার্জি নয়, ব্যানার্জি। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছেন তো আপনি?"

ভদ্রলোক আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। চ্যাটার্জি না ব্যানার্জি, পরীক্ষা করতে ভিজিটিং কার্ডের সন্ধানে পত্রপাঠ মানিব্যাগ বের করলেন। দ্রুতই পেয়ে গেলেন কার্ডটা। 'উত্তর সঠিক হয়েছে' গোছের একটা লুক উপহার দিলেন। গালভরা হাসিতে জানালেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বাংলাদেশে আসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন হবু দৈনিকের পক্ষ থেকে। এরপর, *গৃহপ্রকাশ* অনুষ্ঠানে তিনি যা-যা বলতে চান, তার ছোটখাটো একটা ফিরিস্তি দিলেন।

নোট নিলাম আমি। চা খেলাম একসঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ আড্ডাও পেটালাম। একতরফা আড্ডা। ভদ্রলোক একাই কথা বললেন। টাকার জোরে। জানালেন– যারা আল্লাহ মানে না, তাদের তিনি ঘৃণা করেন। উদাহরণ হিসেবে শামসুর রাহমানের নাম করলেন। আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, "তাহলে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন?"

জিগ্যেস করা হল না। কী লাভ তাতে? আর কতটাই বা তিনি জানেন শামসুর রাহমানকে? রবীন্দ্র, নজরুল আর জীবনানন্দের পর শামসুরই যে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় কবি, সেই তর্ক সব টেবিলে মানায় না। বরং ভদ্রলোককে আরও একটু বুঝে নিতে পারলেই আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারি হয়। একদিকে তিনি ধর্মের দোহাই দিচ্ছেন, অন্যদিকে বোঝাতে চাইছেন, হবু পত্রিকার তিনিই সর্বময় মালিক। 'আল্লাহ ছাড়া কোনও মালিক নাই', ধর্মের এই কথাটি তার মনে থাকছে না তখন।

'মূর্খেষু মূর্খবত্ কথায়েত্' অর্থাৎ 'মূর্খের সঙ্গে মূর্খের মতোই কথা বলো'– চাণক্যের এই শ্লোকটি মাথায় নিয়ে ঘরটিতে ঢুকলেও শেষতক ঐ শ্লোকটির কথা আর মনে থাকল না। বেঁটেখাটো মুসলমান ভদ্রলোকটির চোখে চোখ রেখে বলেই ফেললাম, "আপনার কথায় বুঝতে পারছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও মালিক মানেন না আপনি। তাই বলি কী, মালিক না-হয়ে আপনি এই দৈনিকের একজন সাধারণ কর্মী হয়ে যান; আপনার বিনিয়োগ লাভসহ উঠে আসবে।"

আমার কথায় বেঁটে ভদ্রলোকের আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে টান না-পড়লেও হাসির রঙ গেল বদলে। শক্ত চোয়ালে হাসতে-পারা খুব কঠিন কাজ। তিনি সেটা ভালোই রপ্ত করেছেন।

একদিন পরই হবু দৈনিকটির প্রথম *গৃহপ্রকাশ* সংখ্যা বেরুল। সুধি-পরিবেষ্টিত অনুষ্ঠানে ঘটা করে তার মোড়ক-উন্মোচনও হল। বেশ জমজমাট সেই অনুষ্ঠান। প্রকাশক+প্রধান সম্পাদক আমার সেই লিখিত ভাষণই হুবহু পাঠ করলেন। শুধু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ও 'আসসালামু আলাইকুম'– এই দুটি বাক্য নিজেই যোগ করে নিয়েছেন শুরুতে। দৈনিকের মালিক হলেও তিনি যে আল্লাহ মালিক মানেন, সেকথাই বুঝিয়ে দিলেন প্রকারান্তরে। যদিও সমাজে কল্কে পাওয়ার জন্য মঞ্চে পাশের আসনটিতে বসিয়েছেন সেই শামসুর রাহমানকে, দুদিন আগেই যাকে ঘৃণা করার কথা নিজের মুখে বলেছেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও একটা আসন ছিল মঞ্চে। হবু দৈনিকের হবু যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদকের আগে আমার জন্যও নির্ধারিত ছিল কিছু বলার জন্য কিছুটা সময়। মঞ্চ থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, একটা ফেস্টুনে লেখা আছে– 'স্বাধীন সম্পাদক, স্বাধীন দৈনিক'। ফেস্টুনটির দিকে তাকিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা আগের একটা ঢালিউডি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এক হবু দৈনিকের মালিক+প্রকাশক+প্রধান সম্পাদক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছেন কম্পিউটার রুমে; সঙ্গের এক দাস-কর্মচারী পত্রিকার প্রিন্টার্স লাইনের টেক্সট এগিয়ে দিচ্ছেন গ্রাফিক ডিজাইনারদের হাতে; তাতে সম্পাদকের আগে প্রধান সম্পাদকের নাম শোভা পাচ্ছে।

"বানরের গলায় মুক্তার হার"– শীর্ষেন্দুর ভূত আমার কানে-কানে এই প্রবাদটাই শুনিয়েছিল তখন।

প্রকাশকের চাচাতো ভাই হয়েও পীর হাবিব এই ঘটনায় আমার মতোই কষ্ট পেয়েছে। না সে নাঈমকে ফেলতে পারছে, না চাচাতো ভাইকে। রিপোর্টার হলেও পীরের মধ্যে একটা নরম মন আছে। তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ– নিজের আগে সে অন্যের কথা ভাবে। চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নাঈমের কথাও ভাবে। এই দুজনের পাশাপাশি হবু দৈনিকের সংবাদকর্মীদের কথাও ভাবে। কিন্তু প্রকাশক আর নাঈম আগে নিজেদের কথা ভাবে। প্রকাশক-সম্পাদক বিরোধের নিষ্পত্তি করতেও পীর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমি ওকে বোঝাই– 'টাকা যার ইচ্ছে তার'-এর দেশ বাংলাদেশ; অতএব খেজা দ্যাখা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। তবু পীর শেষচেষ্টা হিসেবে একটা চিঠি নিয়ে আমার বাসায় আসে একদিন। দু-পাতার চিঠিটা ভাই+প্রকাশককে লেখা। সম্পাদক নির্বাচনে ভুলের কারণে কোন-কোন দৈনিকের মৃত্যু হয়েছে এবং সঠিক-সম্পাদককে পেয়ে কোন-কোন দৈনিক লাভের মুখ দেখেছে– চিঠিতে এইসব কথাই লেখা ছিল। আমি ঐ চিঠি প্রাপককে না-দেওয়ার পক্ষেই আমার মত দিই। আমার মনে হয়, তাতে হিতে-বিপরীত হতে পারে। নাঈমের সঙ্গে-সঙ্গে পীরের ওপরও চটে যেতে পারেন প্রকাশক। ফলে, পীরকে ঘিরে এখনও যে একটা নিভু-নিভু সম্ভাবনা আছে হবু দৈনিকটির, তারও মৃত্যু ঘটতে পারে। চাচাতো ভাই বা নাঈম ভাই না-বুঝে পীর তার প্রতিষ্ঠানকে বুঝছে এবং সেটাই আসল বুঝ– সেকথা আমি বুঝি; পীরের চাচাতো ভাই বোঝেন না।

যা হোক, পীর আমার পরামর্শ রেখেছিল।– চিঠিটা ভাই+প্রকাশককে দেয়নি। দু-পাতার সেই চিঠির অর্ধেকটা একদিন আবিষ্কার করলাম আমার হাফগেরস্ত কবিতার খাসকাগজের ভিড়ে। 'ভাই' সম্বোধন করে প্রকাশককে লেখা সেই চিঠির একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্য ছিল– "একজন সংবাদকর্মী হিসেবে সংবাদপত্রশিল্পে আপনার বিনিয়োগে ~~আমি গর্বিত~~ আমি অভিভূত।"

প্রিন্টার্স লাইনে খবরদারি ফলানো ঐ ঘটনার আগেই চিঠির খসড়ায় 'আমি গর্বিত' কথাটি কেটে 'আমি অভিভূত' কথাটি লিখতে হয়েছিল পীরকে। ঘটনার পর ঐ চিঠি লিখলে 'আমি অভিভূত' কেটে 'আমি ক্ষুব্ধ' কথাটিই হয়তো বসাতে হত। পৃথিবীর সব গর্ব, সব বিস্ময় আর সব ক্ষোভই পীর হাবিবের প্রতিক্রিয়ার মতো অর্ধসত্য। মানুষ আজ যা ভাবে, কালই তা বদলে যায়।

পরদিন *গৃহপ্রকাশ* অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে পীর একজন যথার্থ সংবাদকর্মীর ভাষাতেই কথা বলল। ছেড়ে কথা বলল না প্রিন্টার্স লাইনে দখলদারিত্ব ফলানো আত্মীয় প্রকাশককেও। (কিন্তু এও অর্ধসত্য। একদিন পরই আবার বদলে গিয়েছে পীর। যথারীতি চাচাতো ভাই।)

পীর হাবিবের পর আমার বক্তব্য রাখার পালা। আমি একটা কথার ওপরই বিশেষভাবে জোর দিলাম– "ঘরে যে-সম্পাদক স্বাধীন নয়, বাইরেও সে পরাধীন।"

বাজারে আমার বদনাম আছে, কোনও দৈনিকেই আমি বেশিদিন থাকি না; হুট করে চাকরি ছেড়ে দিই।– এটা আমার সম্পর্কিত একটি সর্বজনবিদিত অর্ধসত্য। কিন্তু জীবনে আমি তিনটি মাত্র দৈনিকেই কাজ করেছি। তাও আবার কাগজগুলোর জন্মলগ্নে। তার প্রথমটি *আজকের কাগজ*। আমি ছেড়ে দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে নাঈমসহ প্রায় সবাই সে-দৈনিক ছেড়ে আসে এবং *ভোরের কাগজ* নামে নতুন একটি দৈনিক করে। এরপর আমি যে কাগজটি ছাড়ি, সেটি *মুক্তকণ্ঠ*। আমি ছেড়ে আসার চার মাসের মাথায় কাগজটির সম্পাদক কে জি মুস্তাফাও আমাকে অনুসরণ করেন এবং এক বছরের মধ্যে কাগজটিই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এ-দুটি ক্ষেত্রে আমি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলাম বলেই আমার ধারণা। কিন্তু আমার এই দূরদৃষ্টিসূচক অর্ধসত্যটি বাজার পায় না। পায় আগেরটি।

হবু দৈনিকের দেড় মাসের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে, এখানেও বেশিদিন টেঁকা যাবে না। *গৃহপ্রকাশ* সংখ্যায় সে-আশঙ্কা প্রকাশ করেই 'স্লেটে লেখা নাম আমি মুছে যেতে আসি' শিরোনামে একটি লেখা দিয়েছি। লেখাটির সঙ্গে মিল রেখেই ভাষণে বললাম– "সম্পদ-পাহারায় বড়লোকরা আগে কুকুর পুষত; এখন পোষে দৈনিক। একুশ শতকের দৈনিক হচ্ছে বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুর। মাঝে-মধ্যে সেই কুকুরকে তার প্রভু এদিক-সেদিক লেলিয়েও দেয়। জমিদখল-ব্যবসাদখলে দৈনিককে ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের প্রকাশক তার দৈনিকের সম্পাদককে অভয় দিয়েছেন, নিজের বাড়ির চারপাশে কোনও সীমানা-প্রাচীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলবেন না। অতএব তার কুকুর শুধু তাকেই নয়, সাত গেরামের লোকজনকেও পাহারা দেবে। সেই ভরসাতেই আমরা এই কাগজটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। But every may be has a may not be। যদি প্রকাশক তার কথা রাখেন, তাহলে এই দৈনিকটিতে আপনারা আমাকে দেখবেন। না রাখলে দেখবেন না।"

মঞ্চে-বসা প্রকাশকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমি আমার ভাষণ শেষ করলাম। দেখলাম, তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে এবং হাসির রঙও গেছে বদলে।

ভাষণ-শেষে আমি আর মঞ্চে ফিরে যাইনি। কাম্যুর আউটসাইডারের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি এখানে-সেখানে। ঘটনার অংশ না-হয়ে এইভাবে ঘুরতে পারলেই সবকিছু সানুপুঙ্খ বোঝা যায়। এই জন্যই সচারচর আমি মঞ্চে উঠি না। উঠলেও যে-কোনও অছিলায় সেখান থেকে নেমে পাবলিকের মধ্যে মিশে যাই।– সেই পাবলিক থেকেও কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই একজন মানুষ লেখক হয়ে উঠতে পারেন।

সেরকম দূরত্ব রচনা করেই হলরুমের বাইরে বসে সিগারেট টানছিলাম আমি। হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের গবেষক মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া হামলে পড়লেন আমার ওপর। বললেন, "এক অনুষ্ঠানে তুমি দুইটা ভাষণ দেবে তাই বলে?"

মেজর কামরুলের কথায় রাজা হাসান আর আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বলকেও মুচকি হাসতে দেখলাম। বুঝলাম, তিনজনই তারা ধরে ফেলেছেন, প্রকাশক+প্রধান সম্পাদকের ভাষণটা আমারই লিখে দেওয়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের বিঘতে আমি বহু-বহু বামন মেপেছি

গৃহপ্রকাশ অনুষ্ঠানের পরদিন থেকে হবু দৈনিককে ঘিরে শুরু হল small minds-এর people-পর্ব– পরনিন্দা আর পরচর্চা। বেঁটে ভদ্রলোকের হাসিও সকাল-বিকাল রঙ পাল্টাতে লাগল। তিনি এখন আর নিজেকে প্রকাশক ভাবতে পছন্দ করেন না। এক গৃহপ্রকাশ অনুষ্ঠানই তার মধ্যে অনেক উচ্চাশার জন্ম দিয়ে ফেলেছে। শামসুর রাহমানের সঙ্গে একমঞ্চে বসেছেন, দেশের নামি-দামি লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রিলের পর রিল ছবি তুলেছেন– অতএব শুধু হাসিই নয়, ভদ্রলোকের কথা বলার ঢঙেও বেশ পরিবর্তন এসেছে মাত্র একদিনের ব্যবধানেই। কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের এখন আর তিনি শুধু ডাইরেক্টর বলেন না– বলেন, 'অনারেবল ডাইরেক্টর'। তাকেও সবাই 'মহামান্য প্রধান সম্পাদক' বলুক– বোধহয় সেরকমই আশা করেন মনে-মনে। 'উহ্য' বানান না-জানলে কী হবে, যে-কোনও নামি লেখকের চেয়েও দামি লেখা লিখে দেখিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে করলেই, হবু নির্বাহী সম্পাদককে একদিন ডেকে নিয়ে বললেনও সে-কথা। গ্রাফিক ডিজাইনেও তার জ্ঞানগম্যি কম নয়, জাফর ইকবাল জুয়েলের করা মাস্ট হেডে খবরদারি ফলিয়ে সেটা তো *গৃহপ্রকাশ* সংখ্যাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রধান সম্পাদক হয়েছেন বটে, কিন্তু সম্পাদনা জিনিসটা যে আসলে কী, সেটা তার ভালো জানা নেই। তবে এইটুকু বোঝেন, সম্পাদকের ভাবমূর্তি গুঁড়িয়ে না-দিলে প্রধান সম্পাদকের ইমেজ দাঁড়ায় না। অতএব কারণে-অকারণে নাঈমুল ইসলাম খানের ব্যর্থতার গল্প করাই তার কাজ হয়ে উঠল।

একদিন আমারও গল্প শোনার ডাক পড়ল প্রকাশক+প্রধান সম্পাদকের ফুটানি তলার ঘরে। ভাষণের নোট নিতে এই ঘরে আরও একবার ঢুকেছি। কাজের লোকদের টেবিল-চেয়ার বসেনি, অকাজের লোক টাকার জোরে জায়গা নষ্ট করছে দেখে করপোরেট ফ্লোরের নাম দিয়েছি আমি 'ফুটানি তলা'। সেই ফুটানি নাঈমেরও কম নয়। ফুটানিই নাঈমকে খেয়েছে। নিজের ফুটানি বুঝলেও নাঈম অন্যের প্রয়োজন বোঝে না। হবু দৈনিকের অনেক সাংবাদিকই যখন বেতন-ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাটছে, তখন নারায়ণগঞ্জের এক পাঠকের প্রশ্নের জবাবে বলে এসেছে– "আমিই এদেশের সবচেয়ে বেশি বেতনপ্রাপ্ত সম্পাদক।"

প্রকাশক+সম্পাদক নাঈমের এই বেতন নিয়েও কথা বললেন। তারপর শুরু হল হবু দৈনিকের ইতিহাসপর্ব। এককথায় এর মানে দাঁড়ায়, নাঈমের সঙ্গে আর বনিবনা হচ্ছে না। যদিও একটু পর-পরই মুখে তিনি পাক্কা মুসলমানও সাজছেন– "নাঈম আমার সঙ্গে মুনাফেকি করলেও আমি ওর সঙ্গে গাদ্দারি করব না।"

বার বার একই কথা শুনে প্রায় বিরক্ত হয়েই বললাম, "*কোরানে* মুনাফেকদের থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে মুমিন মুসলমানদের; আপনি তো *কোরান* অমান্য করছেন।"

আমার এই কথাটিতে বেশ উৎফুল্ল মনে হল প্রকাশক+প্রধান সম্পাদককে। বোধহয় ভাবলেন, আসল লোককেই পেয়ে গেছেন তিনি। কারণ, নাঈমকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সম্পাদক হতে পারলেই তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এর জন্য দৈনিকের আদ্যোপান্ত-বোঝা দু-একজন লোক তার হাত-করা দরকার। তো, এই কাজটি অনেক প্রকাশক পত্রিকা বাজারে যাওয়ার পর করেন। মনে হল, অত ধৈর্য ভদ্রলোকের নেই এবং আমাকে চিনতেও কিছুটা ভুল করেছেন।

নাঈমের কিছু দোষ আছে ঠিক, কিন্তু প্রকাশকটিকেও আমার খুব বেশি সুবিধের মনে হল না। এদিকে গত দুইমাস কী পরিশ্রমই না করেছি হবু দৈনিকটির জন্য। পত্রিকার মাস্ট হেড থেকে প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত যত রাজ্যের ভাবনা থাকতে পারে, তার সবই খতিয়ে দেখেছি। অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করেছি সেখানে, যা প্রচল দৈনিকগুলোর একটিতেও নেই। 'লণ্ঠন', 'সাতমহলা', 'পাঠকবন্ধন'-এর মতো এন্তার নামকরণও করেছি নতুন-নতুন বিভাগের। কিছু বাজে বিষয়ের বরাদ্দ কমালেই নতুন অনেক বিষয়ের জায়গা হয়, নাঈমকে বুঝিয়েছি সেকথা। নাঈম ছাড়া আর কোন সম্পাদক আছে, এত তাড়াতাড়ি ভালো প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করতে পারে? কিন্তু ওর ফুটানিই ওকে সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে খাদে ফেলে দেয় বার-বার। এইবার বোধহয় সবটুকু ব্যর্থতা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। কিন্তু নাঈমের অনেক গুণও কি নেই? আজ পর্যন্ত ওর মুখে একটি অভিযোগও শুনিনি আমি প্রকাশক সম্পর্কে। আর সেই প্রকাশকই কিনা তার সম্পাদকের বিরুদ্ধে এত-এত কথা শোনাচ্ছেন আমাকে! নাঈম আমার ছেলেবেলার বন্ধু জেনেও?

নাঈম যা এক বছরেও হবু দৈনিকটির জন্য করেনি, মাত্র দুই মাসে আমি তা করে দেখিয়েছি– এ-জাতীয় কিছু দলে-টানা কথাও ভদ্রলোক বললেন আমাকে। ফুটানি তলায় তার মুখোমুখি ঘরটিই আমার জন্য ভালো হবে, বললেন সেকথাও। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নও দ্যাখালেন, যার সবই টাকা দিয়ে কেনা যায়। কিন্তু তিনি জানেন না, আমার বেশিরভাগ স্বপ্নই টাকায় মেলে না। তাই তার এইসব কথা আমার ভালো লাগল না। গল্পের নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আমি কোথায় বসব না-বসব, সেটা তো সম্পাদকের দেখবার বিষয়। তাকেই দেখতে দিন না। তাছাড়া, নাঈমকে দেখেই আমি এই কাগজে এসেছি। নাঈম না-থাকলে আমিও থাকব না। বাজারে রদ্দি মালের অভাব নেই। ডাকলেই পেয়ে যাবেন। তবে একটা কথা মনে রাখলে আপনারই উপকার হবে– নিয়োগে গুণবিচারী না-হলে বিনিয়োগে সাফল্য আসে না।"

আমাকে বড়শিতে গাঁথতে না-পেরে ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন। চোয়াল এবার এতই শক্ত হয়ে উঠল যে রঙ-টঙ সমেত মুখের হাসিই গেল উবে। মিষ্টি ফোনে নিজেই ঘরে ডেকে এনে রুষ্ট গলায় বিদায় করে দিলেন– "যান, যান।"

আমিও বুঝলাম– এটাই তার আসল চেহারা, এতদিন যা হাসির প্রচ্ছদে ঢাকা ছিল। আর এই সময় শীর্ষেন্দুর ভূতও গ্রামবাংলার একটা বিলুপ্তপ্রায় প্রবাদ শুনিয়ে গেল আমার কানে-কানে– "বেঁটে মুসলমান বদের তাড়ি।"

ওপরের অনেক খবরই নিচে পৌঁছয় না। হবু দৈনিকের নিচতলায় সাংবাদিকতার শিক্ষক-প্রশিক্ষক আর. রাজির টোল তখনও স্বপ্নে ভরপুর। প্রাচ্যের বাঙ্ময় ধারার টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্গে রাজির পাঠ-পদ্ধতিতে মিল খুঁজে পাওয়ায় এই প্রশিক্ষণ ক্লাসকে আমি প্রথম দিন থেকেই 'টোল' বলি। রবীন্দ্রনাথ তার শান্তিনিকেতনে এই প্রাচ্যধারার শিক্ষারীতিই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লেনিনের রাশিয়া ঘুরে সেখান থেকেও অনেক রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি– *রাশিয়ার চিঠি* পড়লে এইসব কথা জানা যায়। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার স্টিফেন স্পেন্ডারের কাছে শান্তিনিকেতনি শিক্ষারীতিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষারীতির চেয়েও দামি মনে হয়েছিল। শুধু এই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেতে পারতেন; কোনও কবিতা না-লিখলেও তার চলত– এই মন্তব্যই করেছিলেন স্পেন্ডার তার শান্তিনিকেতন-অভিজ্ঞতায়। এত কিছু না-জেনেই আর. রাজি আর আসিউজ্জামানকে দিয়ে নাঈম এই টোল চালু করেছে। বলেছে, 'শাহরিয়ারকেও ছেড়ে দাও কিছু ক্লাস। ওর ইচ্ছে মতো পড়াবে। কোনও বাধা দিও না। ওই পারবে ছেলেমেয়েদের ঠিকঠাক তৈরি করে নিতে।"

নতুন তারুণ্য নিয়ে নতুন দৈনিক শুরু করবে নাঈম, এমন একটি অলিখিত ঘোষণা নিয়েই চলছে প্রশিক্ষণের সেই টোল। এই ঘোষণাও যে অর্ধসত্য, তা আমি হবু দৈনিকে ঢুকেই বুঝতে পেরেছি। সত্যের বাকি অর্ধেক বলে, সস্তায় সাংবাদিক না-পেয়েই নাঈম এই প্রশিক্ষণের ফাঁদ পেতেছে। অতএব সেই ফাঁদের কিনারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে মাঝে-মধ্যেই ফাঁসের গেরো খুলে দিয়ে আসি আমি। রাজির অনুরোধে যখনই ক্লাস নিতে যাই, এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী স্বপ্নভরা চোখে তাকায়। তারা জানে না, তাদের স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব নেই এই দেশে। তারা জানে না, যাদের তারা উদ্ধারকর্তা মনে করছে, সেই 'ভালোমানুষগুলো'ই তাদের শ্রমের মূল্য হাতিয়ে নেওয়ার অঙ্কে ব্যস্ত আছে দিনরাত। অতএব, আমি তাদের প্রথমেই বলি, "পূর্ণসত্য বলে কিছু নেই; জগতের সব সত্যই অর্ধসত্য।" আরও বলি, "He who believes all, misses; he who believes nothing, misses।" তারপর তাদের চিরবিকল্প এক সাহসী দৈনিকের গল্প শোনাই– "প্রত্যেকেই তোমরা শাদাকাগজের স্বাধীন সম্পাদক হতে পারো। যে-যার অর্ধসত্য জমা রাখতে পারো সেখানে। আজ না-হলেও একদিন না একদিন তার মূল্যায়ন হবে।"

আমার কথায় টোলের প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়। নতুন-নতুন আইডিয়ার কথা বলে। আর আমি রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলি– "প্রতিভা ও পাগল উভয়েই দশের বাইরে থাকে। পাগল কখনো দশের ভিতরে প্রবেশ করে না; কিন্তু প্রতিভা দশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দশকে একাদশে উত্তীর্ণ করে।"

টোলের প্রশিক্ষণার্থীরা এইকথায় দারুণভাবে আলোড়িত হয়। বলে, "আমরা একাদশী হতে চাই।" (কিন্তু এও অর্ধসত্য। মুখে 'একাদশী'র কথা বললেও তাদের বেশিরভাগই যে একটা চাকরি পেলে বর্তে যায়, সেকথাও সাবেক অভিজ্ঞতা থেকেই জানি)।– ওদের উৎসাহ দেখে আমি নিজেও উৎসাহবোধ করি। ইতিমধ্যেই, যারা জানার তারা জেনে গেছে, সাহসী মানুষের জন্য সব কিছুরই বিকল্প আছে। ভীরুরাই কেবল আপোষ করে টিঁকে থাকে পৃথিবীতে। প্রতিবাদ দূরে থাক, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও জানে না ভীরুরা। মাস শেষে বেতন পেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বামন লোকটিকেও গালিভার ভেবে কুর্নিশ করে। বেঁচে থাকার জন্য কেবল একটাই মন্ত্র শিখেছে তারা– 'চাটিলে প্রভুর জুতো ফি-বছর জুটিবে খোরাকি।' অতএব রাজির টোলের ছেলেমেয়েদের আমি আরও বলি– "কতদিন বাঁচলাম বড় কথা নয়; কীভাবে বাঁচলামই শেষকথা।"

নিৎসে তার *দাজ স্পোক জুরাথ্রুস্ট* বইয়ে বামনদের থেকে সরে-সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন উঁচুমানবদের। যারা সরে-সরে যেতে জানে, তাদের জন্য ভালোভাবে বেঁচে থাকার হাজার বিকল্প অপেক্ষা করে। আগামী দিনের সংবাদকর্মীদের আমি নিৎসের সেই বামনদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে বলি।

একদিন টোলের একটি মেয়ে কবিতা শুনতে চেয়ে সঙ্গের ব্যাগ থেকে আমার কবিতার বই বের করলে আমি আড়চোখে টোলের পণ্ডিত আর. রাজির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাই। এসেছি সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ ক্লাসে। তার আবার নাম দিয়েছি 'টোল'। (যদিও রাজির বেশ পছন্দ এই নামকরণ।) তাই বলে প্রশিক্ষণের টোলেই কবিতার খামার? না, রাজি অনুমতি নিয়েই বসে আছে আমার পাশে। রাজির অনুমতি পেয়ে আমি ছোট একটা কবিতা পড়ি। চিরবিকল্পের কবিতা–

> এই নাও বিকল্পের চাবি। চেয়ারে দুর্ভিক্ষ হলে টুলে বসো, মাদুর বিছাও। মাদুরে দুর্ভিক্ষ হলে মাটি। মাটির বিকল্প নাই, আজও তাই খালি পায়ে হাঁটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ-কেউ খ্যাতিমান মিডিয়ার ম্যানিপুলেশনে

এরমধ্যেই একদিন আমার এক আত্মীয়র ফোন পেলাম। লতায়-পাতায় ভাই। নিজেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে জাহির করতে ভালবাসে। বউকে বোরখা পরিয়ে রাখলেও নিজে শেরাটনের ফ্যাশন শোয়ে যায়। একাত্তরের দিনগুলোকে 'গোলমালের বছর' বলে। পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের এক নম্বর ভক্ত। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের খেলা হলেও ভক্তির পরিবর্তন হয় না। ফোনে আমার গলা চিনতে পেরে কোনও ভূমিকা ছাড়াই জানায়, *তসলিমা নাসরিন ক* নামের একটি বই তার পড়া হয়ে গেছে। সে-বইয়ে অনেক বড়-বড় কবি-লেখকেরই মুখোশ খুলে গেছে। খোঁচা দিতে ছাড়ে না, আমার কথাও সেখানে আছে।

তসলিমার বইয়ের কথাগুলো কতখানি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে, জানতে চাইলে বলে, "১০০ ভাগ।" আমি তাকে ১০০ ভাগ বিশ্বাস করার পরামর্শ দিলে, রীতিমতো ফতোয়াই দিয়ে বসে, "এদেশের সব প্রগতিশীল মানুষই চরিত্রহীন। তাদের আসল চেহারাই ফুটে উঠেছে তসলিমার ক-এ।"

বছর দশেক আগের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তসলিমাকে তখন 'মুরতাদ' বলে দেশ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে মৌলবাদীরা। লেখকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে নিয়ে কথা বলায় আমার এই আত্মীয়টি সেদিন আমাকে 'কাফের' বলে গালি দিয়েছিল। বলেছিল, "তসলিমার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের মতো লোকদেরও ফাঁসি হওয়া উচিত।" সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "তসলিমা যখন ১০০ ভাগই বিশ্বাসযোগ্য তোমার কাছে, তাহলে আর আল্লাহ মানো কেন? আজ থেকে বরং তসলিমার মতোই নাস্তিক হয়ে যাও।"

তসলিমাভক্ত আত্মীয়টি নিঃশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল। আর আমারও মনে পড়ে গেল শঙ্খ ঘোষের কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি—

পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পুলিশে'র জায়গায় নাসরিন বসিয়ে নিলেও অর্থের হেরফের হয় না। যে-ধর্মান্ধরা একদিন তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মিছিল নামিয়েছিল রাস্তায়, তসলিমার নতুন বইটিকে নিয়ে তারাই আজ বেশি প্রফুল্ল। মনে-মনে হাসলাম। তসলিমার *লজ্জা* থেকে ফায়দা লুটেছিল ভারতের মৌলবাদীরা। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা অসন্তুষ্ট ছিল তখন তসলিমার ওপর। সেই অসন্তোষ দূর করতে বাজারে এসেছে *তসলিমা নাসরিন ক*। যে-মৌলগন্ধী পত্রিকাগুলো একদিন তসলিমার বিরুদ্ধে, তসলিমার *লজ্জার* বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, তারাই এই বইটিকে নিয়ে উৎসাহ দ্যাখাচ্ছে বেশি। সেই উৎসাহ দেখে শীর্ষেন্দুর ভূত নিশ্চয়ই এতক্ষণে বলতে শুরু করে দিয়েছে– "অতএব বিশ্বাসীগণ, তসলিমার যাবতীয় কথাই সত্য বলিয়া জানিবে। নিশ্চয়ই সে সত্যভাষী। ক-এর মতো তার *লজ্জাও* সত্য বৈ মিথ্যা ছিল না। অতএব একদা তসলিমাকে 'মুরতাদ' বলিবার জন্য তোমাদের এখন প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। ক-এ তসলিমা যাহাদের অভিযুক্ত করিয়াছে, তাহাদের কেহই তাহাকে গৃহ হইতে তুলিয়া আনে নাই। তসলিমা স্বেচ্ছায় তাহাদের নিকট গিয়াছে। কিন্তু একাত্তরে তোমরা এ দেশের নিদ্রামগ্ন কন্যা-জায়া-জননীদের গৃহ হইতে তুলিয়া নিয়া ধর্ষণ করিয়াছিলে।"

এর পর থেকে যে-টেলিফোনই ধরি, সেই একই প্রসঙ্গ। এরমধ্যে ক নিয়ে দৈনিক *যুগান্তরে* রিপোর্টও করে ফেলেছে কাগজটির তরুণ রিপোর্টার হাসানুজ্জামান সাকী। সেই রিপোর্টের পর অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তসলিমার ওপর। যৌনগন্ধী পত্রিকাগুলো তো ক থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা হুবহু ছাপিয়ে দিয়ে কোমর বেঁধেই ব্যবসায় নেমেছে। আর সেই সঙ্গে বইবিমুখ দেশে হুজুগে পাঠকের সংখ্যাও গেছে হঠাৎ করে বেড়ে। যাদের হাতে কস্মিনকালেও কোনও বই দেখিনি, তারাও দুদিনেই তসলিমার বইয়ে হাফেজ। শুনতে পাই, শাহবাগ আজিজ মার্কেটে দেদারসে বিক্রি হওয়ার পর ক নাকি পত্রিকার হকারদেরও হাতে-হাতে। এত-এত মতবিনিময় সভার পরও নাঈমের হবু দৈনিক হবুই থেকে যায়, অথচ তসলিমার বই নিঃশব্দে বাজারে ঢুকে দুদিনেই বেস্টসেলার। এ-নিয়ে একদিন ঠাট্টাও করি নাঈমের সঙ্গে। বলি– "নাসরিনকে বিয়ে করলেও ওর কাছ থেকে তুমি প্রচার-প্রসারের কিছুই শিখতে পারোনি। তোমার সম্পাদিত *খবরের কাগজ* দিয়েই ওর খ্যাতির শুরু। এরমধ্যে নাসরিন সারা পৃথিবী ঘুরে ঢাকার বাংলাবাজারে ফিরে এসেছে। আর তুমি কিনা এতবছর পর একজন উটকো প্রকাশককে নিয়ে দৈনিক করার কথা ভাবছ।"

আমার কথায় নাঈম সুদূরের গলায় পুনর্মূল্যায়ন করে, "এই প্রকাশকের চেয়ে শাহেদ ভাই হাজার গুণ ভালো ছিলেন।"

শাহেদ ভাই মানে কাজী শাহেদ আহমেদ। *আজকের কাগজের* প্রকাশক+সম্পাদক। নাঈমের সম্পাদনায় দৈনিকটির শুরু। প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই সম্পাদক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক বিরোধ। নাঈমের সম্পাদনায় নতুন দৈনিক *ভোরের কাগজের* জন্ম। এক বছর যেতে না যেতেই সেখানেও বিরোধ। বাংলা দৈনিকে নতুন ধারার প্রবর্তক নাঈমুল ইসলাম খান দৈনিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এরপর *ভোরের কাগজ* ভেঙে একসময় *প্রথম আলো*। নাঈম প্রবর্তিত ধারারই ধারাবাহিকতা। নাঈমের হাত ধরে যারা একদিন সাংবাদিকতায় উঠে এসেছিল, তাদের অনেকেই আজ তারকা। শুধু নাঈমই কোনও দৈনিকের সম্পাদক নয়। একটি সংবাদ-নির্ভর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে তার। মাঝে-মধ্যেই বাজারে রোল ওঠে, নাঈম নতুন দৈনিক করছে। 'সেই নাঈমুল খান' শিরোনামে বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। কিন্তু নাঈমের দৈনিক আর বাজারে আসে না। না আসুক। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রও তো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু সেই 'আদর্শ' এখনও মানুষের চিন্তারাজ্যকে ছুঁয়ে আছে। নাঈমের কাছেও তেমনি একটি আদর্শ দৈনিক আছে। সেই দৈনিক করার টাকা তার নেই। টাকা আছে মুক্তবাজারীদের কাছে। সেই টাকার কোনও আদর্শ নেই, যা আছে নাঈমের স্বপ্নের দৈনিকে। তাই প্রতিদিনই নতুন-নতুন ভাবনায় নাঈম তার আদর্শ দৈনিকটিকে নবায়ন করলেও সেই দৈনিক প্রকাশিত হয় না। নাঈমের সেই স্বপ্নের দৈনিকই যে 'আরও ভালো একটি দৈনিক', সেকথা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। কিন্তু সেটিও অর্ধসত্য। যেহেতু নাঈমের টাকা নেই। মাঝে একবার ফেলে-আসা *আজকের কাগজেই* উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে এক বছর কাজ করেছে নাঈম। অর্থাৎ আবার সেই কাজী শাহেদের সঙ্গেই। কাজী শাহেদ আহমেদই তাকে আবার কিছু নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছেন। তাই তার প্রতি নাঈমের মনে নিভৃত কৃতজ্ঞতা আছে, বুঝতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয়, নাঈমের কথা ভেবে। তার আদর্শ দৈনিকটিই বৃহত্তর মানুষের স্বপ্নের দৈনিক। কিন্তু সেটি বাজারে আসে না। আমি নাঈমকে আবার নতুন করে শুরু করতে বলি। উৎসাহ দিতে ঈশ্বর গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকরের* গল্প মনে করিয়ে দিই। কত সামান্য টাকায় তিনি বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা শুরু করেছিলেন, বলি সেই কথা। আরও বলি, নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়ে নাঈম তার স্বপ্নের দৈনিক কোনওদিনও বাস্তবায়ন করতে পারবে না। অতএব তাকে মালিক-সম্পাদকই হতে হবে। আজকের বাস্তবতায় একজন সৃষ্টিশীল সম্পদকের জন্য মালিক-সম্পাদক হওয়াই একটি গণমুখী দৈনিকের পূর্বশর্ত– আমার এই কথায় নাঈমের নীরবসম্মতি লক্ষ করি।

নিয়োগপ্রাপ্ত সম্পাদক একশ বছর আগেও একজন দাস-সম্পাদকই ছিলেন। এলবার্ট হাবার্টের (১৮৫৯-১৯১৫) সেই বিখ্যাত উক্তিটিও সেই সাক্ষ্যই দেয়– "সম্পাদক হচ্ছেন সেই নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সারাদিন যে খোসা থেকে শস্য আলাদা করে এবং পরদিন দেখতে পায়, পত্রিকায় কেবল খোসাগুলোই ছাপা হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর সব গল্প কম-বেশি আদিরসাত্মক

তখনও আমি ক-এর চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। কিন্তু ঘরে-বাইরে সর্বত্রই শুনতে পাচ্ছি বইটির কথা। আমার সম্পর্কেও কিছু কথা আছে বলে খোঁচা দিয়ে কথা বলার লোকেরও অভাব নেই। এর আগেও কোনও একটি বইয়ে তসলিমা আমার মৃদু সমালোচনা করেছে। কিন্তু ফোনের বাড়াবাড়িতে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, এবারের সমালোচনায় ঝালের পরিমাণ একটু বেশিই আছে। কোথাও কারও প্রশংসায় কেউ দু'কলম লিখলে এই ফোনগুলো আসে না– সেকথা আমার ভালোই জানা। অতএব কিছুটা কৌতূহলও তৈরি হয় তসলিমার বইটিকে নিয়ে। জয়ন্তকে ফোনে-ফোনেই জানাই, এক কপি সর্বশেষ তসলিমা আমার বাসায় পাঠিয়ে দিতে। জয়ন্ত মানে *বইপত্রের* জয়ন্ত। শাহবাগ আজিজ মার্কেট তার ঠিকানা। জয়ন্তকে বললে সে দেশের বাইরে থেকেও বই আনিয়ে দেয় আমাকে। তসলিমার ক তো তার নাগালের র‍্যাকেই। অতএব ঐদিন রাত্রেই সে বইটি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় একজনকে দিয়ে।

এরমধ্যে আমার কাছে থাকা তসলিমার চিঠিপত্র, ছবি ইত্যাদির ইঙ্গিত দিয়ে কোনও-কোনও পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে। সেই রিপোর্টের সূত্র ধরে একজন ডাকসাঁইটে প্রকাশক আমার বাসা পর্যন্ত ঘুরে গেছেন। আগে কখনো আমার নির্জন ডেরায় তার পায়ের ধুলো পড়েনি। পাক্ষিক *আনন্দভুবন* অস্থির করে ফেলেছে কাগজটির ঈদসংখ্যায় তসলিমাকে নিয়ে একটা লেখা দেওয়ার জন্য। সাহিত্য বিকাশের ফজলুর রহমান আমার সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত অগ্রন্থিত কবিতা সমগ্র*সহ বেশ কটি বইয়ের প্রকাশক। একদিন টেলিফোনে জানালেন, বাসায় আসতে চান। ফজলু আমার বাসায় ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়াও আসেন। আমার সম্মতি পেয়ে সে-রাতেও হানা দিলেন। সোফায় হেলান দিয়েই প্রশ্ন করলেন, "শুনলাম, তসলিমাকে নিয়ে বই লিখছেন?"

বুঝলাম, বাংলা বাজারেও রটে গেছে কথাটা। বললাম, "তসলিমাকে নিয়ে বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছি, একথা আপনাকে কে বলল? আমি আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখি। তাতে তসলিমা আসতেও পারে, না-ও পারে।"

শুচি সৈয়দ তখন আমার বাসায়। শুচি আমার পুরানো সহকর্মী। *আজকের কাগজ*, *মুক্তকণ্ঠ* ও *যুগান্তরে* আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। শুচি ছাড়াও হবু দৈনিকের হবু সিনিয়র সাব এডিটর রনজু রাইমও আছে। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল কেভিন গিলবার্ট। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কবি। ১৯৯৩ সালে লোকান্তরিত হয়েছেন। তার *ব্ল্যাক ফ্রম দ্য এজ* বইটি নেড়েচেড়ে দেখছিল শুচি আর রনজু। সম্প্রতি এই কবির সম্পাদিত *ইনসাইড ব্ল্যাক অস্ট্রেলিয়া* বইটাও আমি সংগ্রহ করেছি। সেখানে আরও অনেক আদিবাসী কবির কবিতা আছে। সেই বইও শুচি আর রনজুর দিকে বাড়িয়ে দিই। ১৯৭২ সালে ক্যানবেরায় 'আদিবাসী তাঁবু দূতাবাস' প্রতিষ্ঠা করলে গিলবার্টকে নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সেই হইচই তসলিমার ক-এর মতো সস্তাদামে কেনা হইচই নয়। শাদা চামড়ার অস্ট্রেলিয়ানদের টনক নাড়িয়ে দিয়েছিলেন কেভিন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে আদিবাসী ও না-আদিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। শুধু কবিতার জন্যই নয়, 'ট্রিটি ১৯৮৮' নামের এই চুক্তির কারণেও কেভিন অমর হয়ে থাকবেন।

কিন্তু নোবেল-বুকার না-পেলে আমাদের মিডিয়া কেভিন গিলবার্টের মতো মহান কবি-লেখকদের খবরই রাখে না। আর যাই হোক, সেই নোবেল বা বুকার পেতে হলেও কিছু যোগ্যতা লাগে। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপক তসলিমা নাসরিনের সেই যোগ্যতা নেই। তবে প্রচারপটুতার জোরে দুনিয়াজোড়া নাম হয়েছে তার। এর জন্য সবচেয়ে সহজ রাস্তাটিই সে বেছে নিয়েছে। পুঁজি করেছে যৌনতাকে। প্রচার পেলে উলঙ্গ হতেও সে রাজি। ইউরোপে এখন হরতাল-ধর্মঘটের বদলে উলঙ্গ-দৌড়ের কদর বেড়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে-দৌড় দেয়। তবে প্রতিবাদের দৌড়ে তেমন একটা যৌনতা নেই– যতটা আছে তসলিমার লেখায়। প্রকাশ্যে যৌন-উত্তেজক কিছু করাকে যৌনবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'এক্সিবিশনিজম' বা 'প্রদর্শনবাদিতা' বলে। নিজের আড়াল-শরীর অন্যকে দেখিয়ে বিকৃত যৌনতৃপ্তি পাওয়াকেই প্রদর্শনবাদিতা বলে। এই বিকৃতি পুরুষের মধ্যেই বেশি লক্ষ করা যায়। এই কাজে অপরিচিত নারী ও শিশুকে বেছে নেয় বিকৃত পুরুষটি। প্রদর্শনকাল ছাড়াও পরবর্তী সময়ে ঘটনাটিকে স্মরণ করে স্বমেহনের মাধ্যমে যৌনতৃপ্তি লাভ করাই এই বিকৃতির লক্ষণ। তুলনামূলকভাবে কম হলেও নারীদের মধ্যেও বিকৃতিটি একবারে দুর্লভ নয়। তসলিমার ক-ই তার বড় প্রমাণ। বইটির ভালো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করত পারত মামুন হুসাইন। ছোটগল্পকার মামুন আবার নামি মানসিক চিকিৎসকও। কথাও বলতে পারে সুন্দর। এখন পাবনা মানসিক হাসপাতালে আছে। রামেন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুমদার আর আবদুল্লাহ আল মামুন সেই হাসপাতালপরিদর্শনে গেলে কী-কী কথা হয়েছিল তার সঙ্গে, একদিন খুব রসিয়ে সেই গল্প করেছিল মামুন হুসাইন।– আমি আর রাজা হাসান মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। গল্পটা শুনলে যে কারও মনে হবে, মানসিক চিকিৎসা করাতেই বোধহয় গিয়েছিলেন রামেন্দু আর আবদুল্লাহ।

আমাদের আড্ডার মধ্যেই *দলছুটের* সঞ্জীব চৌধুরীর টেলিফোন ছুটে আসে। রিসিভার তুলতেই তার অতিপরিচিত সূচনাকথন, "দাদা, কেমন আছেন? অধমের নাম সঞ্জীব।" আমাকে কুশলবিনিময়ের সুযোগ না-দিয়েই সঞ্জীব বলতে থাকে, "'কিলো পঞ্চাশেক শরীরের ওজনে এইটুকুন নিতম্ব'– কেউ যদি তার লেখায় কোনও মানুষকে এই ভাষায় চিত্রিত করে, তাকে আপনি কোন রুচির লেখক বলবেন?"

সঞ্জীব বরাবরই এমন আকস্মিক। হঠাৎ কাকে কী মনে করে ফোন করবে, তা কেবল ও নিজেই জানে। আমি ওর কথার সূত্র ধরতে না-পেরে জিগ্যেস করি, "কে কার পাছার বিবরণ দিয়েছে?"

সঞ্জীব উত্তরের ধারে-কাছেও না-গিয়ে বলে, "যে যার পাছা নিয়েই লিখুক না কেন, বলেন দাদা, সে কোন রুচির লেখক?"

আগে সঞ্জীবের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে তাকে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না বুঝতে পেরে বলি, "আধুনিক যুগের সমাপ্তি হয়েছে। এখন উত্তরআধুনিক যুগ। অতএব সব রুচিকেই সে ধারণ করে। এখন বলো, কে কার সম্পর্কে লিখেছে ঐ কথা?"

"তসলিমা নাসরিন লিখেছে আমাদের নাঈম ভাই সম্পর্কে। আরও লিখেছে, নাঈম ভাইকে নাকি শাহেদ ভাই অর্ধচন্দ্র নয়, পূর্ণচন্দ্র দিয়েই বিদায় করেছিলেন। আহা, সেই পূর্ণচন্দ্রের দাগ তো তাহলে আমাদের অনেকের কপালেই তিলক হয়ে আছে! নাঈম ভাইয়ের সঙ্গে আমরা সবাই তো সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। কাজী শাহেদকে খুশি করতে গিয়ে বালিকা আমাদের সবাইকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। সবাইকে পূর্ণচন্দ্র মানে পূর্ণিমা দিয়েছে। আর নিজের জন্য রেখেছে সেই অর্ধচন্দ্র মানে গলাধাক্কা। এই উদারতার জন্য ঈশ্বর বালিকার মঙ্গল করুন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব মিথ্যা মিথ্যা নয়, সব সত্য অর্ধপরিচিত

ইতিমধ্যে *তসলিমা নাসরিন* ক-এর অনেক কিছুই এক হুজুগে পাঠকের মুখ থেকে শোনা হয়ে গেছে। এই শোনাশুনির মধ্যেই একদিন শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথা হল ফোনে। বইটির প্রসঙ্গ উঠতেই একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন কবি। যেন তসলিমাকে তিনি ভালোভাবে চেনেনই না। যেন 'তসলিমার কলমের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক' বলে কখনও কোনও লেখাও লেখেননি। প্রেমেভরা জীবন শামসুর রাহমানের। কিন্তু প্রেমিকাদের তিনি আড়াল করে রাখতেই ভালবাসেন। তাই দান্তে যেমন বিয়াত্রিচকে, মায়াকোভস্কি যেমন লিলিকে পাঠকদের হৃদয়ে অমর করে রেখে যান, শামসুর রাহমান তা পারেন না। এই জায়গাটিতে এসে তিনি সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় পান। আত্মজীবনী লিখছেন। সেখানেও আলেকজান্দ্রিয়ার কবি কনস্তান্তিস কাভাফির মতো নির্ভয়ে বলতে পারেন না– "এর চেয়ে ভালো থাকার জায়গা আমি আর কোথায় পেতাম? এর দোতলায় রয়েছে একটা বেশ্যালয় যা শরীরের চাহিদা মেটায়; কাছেই আছে গির্জা যেখানে পাওয়া যায় পাপের মার্জনা আর একটু দূরে রয়েছে একটা হাসপাতাল যেখানে লোকে মরতে পারে।"– কবির জীবনীতে পাঠক এরকম সাহসী কথাই শুনতে চায়। সেই সাহস শামসুর রাহমানের নেই। তিনি এবারও বলতে পারতেন সেই একই কথা– 'তসলিমার কলমের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক'। না, তা বলেন না। তসলিমার রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলেই নীরব হয়ে যান। ফলে শামসুর রাহমানের সঙ্গে না-হওয়া কথা ফরিদ কবিরের বউ ঝর্ণার সঙ্গে হয়।

তসলিমার ক ঝর্ণারও পড়া হয়ে গেছে। নিরীহ ফরিদের কথাও এসেছে তাতে। ফরিদের চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছে তসলিমা; বলেছে, "শেওড়া গাছের ভূতের মতো দেখতে ফরিদ কবির।" এছাড়া বেশি কিছু লেখেনি। নিরীহতম হেলাল হাফিজকেও ছেড়ে কথা বলেনি। কীভাবে হেলালকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আছে সেই বীরাঙ্গনাগাথাও। আমার সম্পর্কে অভিযোগ, আমি চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম; আমার সেই বন্ধুত্বহরণকারী চেষ্টা তসলিমা বীরাঙ্গনাবিক্রমে বিফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিয়েছে। আরও দু-এক জায়গায় আরও দু-একটি কটাক্ষ। কোথাও-কোথাও দু-এক ফোঁটা আদিরসও আছে।

ঝর্ণার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ফরিদের মোবাইলে। বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ফরিদ ওর মোবাইল সেটটি বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে।

তসলিমার মতো ঝর্ণাও ময়মনসিংহের মেয়ে। ময়মনসিংহ আমার নানার বাড়ি। সেখানে আমার শৈশব এবং মেডিকেলের ছাত্র থাকাকালীন তারুণ্যের কিছু সময় কেটেছে। মেডিকেলে তসলিমা আমার ক্লাসমেট ছিল। ঝর্ণাকেও আমি সেই সময় থেকে চিনি। ঝর্ণা তখন ফ্রকপরা স্কুলের কিশোরী। থাকত আমার নানার বাড়ির উল্টো দিকের গলিতে। সেই ছেলেবেলাতেও আমাকে ঝর্ণা 'তুমি' সম্বোধন করত; এখনও করে। আগের 'তুমি'র চেয়ে ওর এখনকার 'তুমি'গুলো সুন্দর শোনায়। ফরিদের মধ্যে ঈর্ষা জাগাতে বলেছিও সেকথা। কিন্তু ফরিদ আমাকে এতটাই বন্ধু জানে যে ওর মনে ঈর্ষা জাগে না। উল্টো ঝর্ণার সঙ্গে সামান্য কথা বলে মোবাইল সেট বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। ঝর্ণার কথা দিয়েই শুরু হয় আমাদের কথোপকথন –

ঝর্ণা : সৈয়দ হক, মিলন, নাঈম, মিনার এত কিছু করল তসলিমার সঙ্গে; ফরিদ আর তুমি তো কিছুই করতে পারলা না।

আমি : একটা চিনা প্রবাদ আছে, শোনো– 'পৃথিবীতে তুমি দুজন মাত্র ভালো মানুষ পাবে– একজন মারা গেছেন; আরেকজন এখনও জন্মাননি।' যা ঘটেছে, তসলিমা তারচেয়ে অনেক কম লিখেছে। সবার সম্পর্কেই কম লিখেছে। আমার সম্পর্কেও।

ঝর্ণা : কম লিখেছে? সৈয়দ হক তো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সর্বৈব মিথ্যা'?

আমি : 'সর্বৈব মিথ্যা' না-বলে হক ভাই বলতে পারতেন 'অর্ধসত্য'। সৈয়দ হক তো *নূরলদীনের সারা জীবন* বা *পরানের গহীন ভিতর* এর মতো বইও লিখেছেন, নাকি? কিন্তু তসলিমা শুধু *খেলারাম খেলে যা* ই দ্যাখে। এটা ওর দ্যাখার সমস্যা।

ঝর্ণা : কী বলতে চাও, যাদের কথা লিখেছে তসলিমা, সবাই সাধু?

আমি : দ্যাখো, কেউ আমরা সাধু না। শামসুর রাহমান, সৈয়দ হক, নাঈম, মিলন, মিনার কেউ না। তুমি, আমি, ফরিদ, তসলিমাও না। যারা তসলিমার বই নিয়ে মজা লুটছে, তারাও না। সবার মনেই অনেক আবর্জনা আছে। কেউ যদি বাইরে থেকে এসে কিছু আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দূর করে, তাকে আমাদের প্রথমেই ধন্যবাদ জানানো উচিত। তসলিমাকেও ধন্যবাদ। বিনয় মজুমদারের কবিতার দুইটা লাইন শোনো– "মন্দিরেও আবর্জনা জমে বহু প্রতিদিন দেখি।/সেই সব আবর্জনা আমার হৃদয় থেকে ঝাঁট দিয়ে বার করি আমি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝর্ণা : আবর্জনা দূর করার জন্য তসলিমাকে লাগল কেন? নিজের ময়লা তো নিজেই দূর করতে পারতা। পারতা না?

আমি : আমি তো আবর্জনা মনে করি নাই। লক্ষ্মীর কৌটার মোহর করে রেখেছিলাম। সেই মোহরকেই তসলিমার আবর্জনা মনে হয়েছে। তাই ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।

ঝর্ণা : তোমার কথা লিখেছে, তুমি ওকে খালি বাড়িতে ডেকে এনে চুমু খেতে চেয়েছিলে। কথাটা কি সত্যি?

আমি : দ্যাখো, জগতে পূর্ণসত্য বলে কিছু নেই; সবই অর্ধসত্য। আমি তো মনে করি, জগতের সব প্রাণীর মতো মানুষের স্বভাবেও বহুগামিতা আছে। এই কথা আমি কবিতাতেও বলেছি– "জগতে সকল প্রাণী বহুগামী; কেন তবে মানুষেরা নয়?/ যে যত মানুষ তার তত বেশি লোকনিন্দাভয়।" তসলিমা-মুরগি আরমানিটোলা না নয়াপল্টন থেকে ডানা ঝাপটাতে–ঝাপটাতে আমার রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ছয়তলার অ্যাপার্টমেন্টে উঠে আসতে পারলে আমি-মোরগ তার কাছে ঘেঁষতে পারব না কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে, সত্যতা প্রমাণের জন্য কিছু না-কিছু এভিডেন্স তো হাজির করতে হবে, নাকি? খালি বাড়িতে তো আমি আর তসলিমা ছাড়া কেউ ছিল না। এখন আমিও যদি ওর মতো বলি– 'তসলিমা আমার প্যান্টের জিপার ধরে টানাটানি শুরু করেছিল'; তুমি কারটা বিশ্বাস করবে? তারটাই বিশ্বাস করা উচিত, যে কিছু প্রমাণ হাজির করতে পারবে। তাই কি হওয়া উচিত নয়?

ঝর্ণা : তুমি নিজেকে বাঁচাতে চাচ্ছ তো?

আমি : কী বাঁচাব? ও তো আমার সম্পর্কে তেমন কিছু লেখেনি। পুরানো ঝাল মিটিয়েছে। পাত্তা না-পাওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে।

ঝর্ণা : প্রতিশোধ?

আমি : ফরিদকেই জিগ্যেস করো ওকে 'শেওড়াগাছের ভূত কেন' বলেছে? ফরিদ ওর সম্পাদিত *৫০ বছরের প্রেমের কবিতায়* তসলিমার কবিতা নেয়নি, তাই। যে-বছর বইটা বেরুল, ফরিদের সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছিল বইমেলায়। আমরা বন্ধুরা তসলিমাকে সামাল দিয়েছি। তারপর থেকেই ফরিদকে ও 'শেওড়াগাছের ভূত' ডাকতে শুরু করে। হক ভাইয়ের শ্যালিকারটাও আমার কাছে প্রতিশোধ বলে মনে হয়েছে। সেই শ্যালিকা আর তার বরকে আমি খুব ভালো ভাবে চিনি। দুজনেই ওরা শিল্পী। বরাট কিছুদিন আমার সহকর্মীও ছিল *গতিতে*। তসলিমাকে সেই 'শ্যালিকা' পছন্দ করত না। খুব কম মেয়েকেই দেখেছি– তসলিমাকে পছন্দ করে। নাসিমা সুলতানা তো সহ্যই করতে পারত না ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

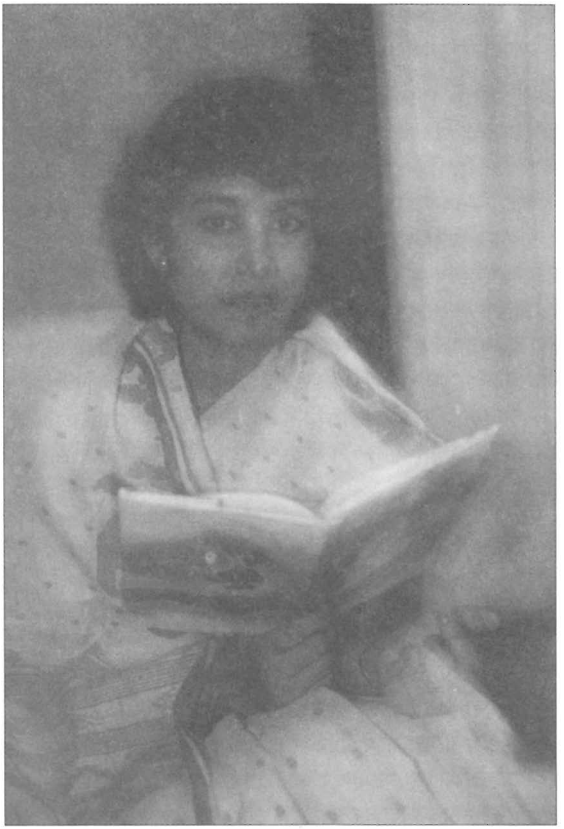

গ্রন্থকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ* হাতে তসলিমা নাসরিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝর্ণা : কিন্তু তোমার ওপর ক্ষেপল কেন? তুমি কী করেছিলে?

আমি : কিছু করি নাই বলেই তো আমার ওপর রাগ। অনুরাগও বলতে পারো।

ঝর্ণা : খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্য। তসলিমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলে; পারোনি।

আমি : দ্যাখো, চুমু একটা মামুলি ব্যাপার। ফরিদ কষ্ট না-পেলে তোমাকেও খেয়ে দিতে পারি। কিন্তু তসলিমাকে আমি চুমু খেতে চেয়েছিলাম, না আমাকে তসলিমা– সেকথা আমাকে লেখা ওর চিঠিগুলো পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে। আমার কবিতার জবাবে ও কবিতাও লিখেছে অনেক। সেগুলো পড়া থাকলেও তুমি জানতে, প্রেমের গতিপথটা কোন দিক থেকে কোনদিকে প্রবাহিত হয়েছিল। তবে নিজেকে ধোয়া তুলসী পাতা দাবি করব না আমি হক ভাইয়ের মতো। ভালোই লাগত ওর চিঠি পেতে, আমাকে নিয়ে-লেখা কবিতা পড়তেও। ফোনের দীর্ঘশ্বাসগুলোও।

ঝর্ণা : তুমি নাকি ওর রূপেরও প্রশংসা করেছিলে?

আমি : করতেই পারি– তসলিমা তো অসুন্দর ছিল না দেখতে। এখনও সুন্দরই আছে; একটু মুটিয়ে গেছে, এই যা। হয়তো বলেছিলাম, "তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।"– এই কথা তো তোমাকেও কত বলেছি। 'রূপের প্রশংসা' শুনতেই তো তসলিমা আমার *গতি*তে ঘন-ঘন আসত। আসাদ মান্নান, ফরিদ কবির, আনিস রহমান, উত্তম সেন, শুচি সৈয়দ, সুহিতা সুলতানাসহ অনেকেই তার সাক্ষী আছে।

ঝর্ণা : তুমি নাকি চেয়েছিলে....?

আমি : কী চেয়েছিলাম, তো মহাজাতকের জানার কথা; তসলিমা কি জ্যোতিষীও নাকি? যাক, লিখে যখন শান্তি পেয়েছে, পাক। কিন্তু আমার কবিতার জন্য ও যে ন্যুড মডেল হতে চেয়েছিল, সেকথা কিছু লেখে নাই।

ঝর্ণা : মডেল? তা-ও আবার ন্যুড? কী বলছ তুমি!

আমি : অবাক হওয়ার কী আছে? শিল্পে যদি মডেল চলে, কবিতায় নয় কেন? নতুন কিছু করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তসলিমার সবসময়ই ছিল। তাছাড়া, কবিতা তো ভালো লিখতে পারত না; তাই কবিতার মডেল হয়েই বিখ্যাত হতে চেয়েছিল একসময়। আমার কাব্যগ্রন্থ হাতে এক রিল ছবিও তুলেছিল একবার।

ঝর্ণা : সত্যিই কি তসলিমা ন্যুড-মডেলও হয়েছিল? এ তো একটা দারুণ খবর! চেপে রেখেছো কেন এতদিন?

আমি : হ্যাঁ, এগুলোই এদেশে দারুণ খবর। একটা ভালো গদ্য কিংবা ভালো কবিতা কোনও খবর না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল পড়ে পাতা নড়ে, লেজ নাড়ে বুশের কুকুর

সে-রাতে বাড়ি ফিরে *তসলিমা নাসরিন ক* পড়তে শুরু করলাম। 'ক' মানে 'বল'। পূর্ণসত্য বলে কিছু না-থাকলেও জগতে অনেক পূর্ণমিথ্যা আছে। তবু লোকে সেইসব পূর্ণমিথ্যাকেই যুগ-যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে। যেমন ভূত মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা– তবু দশচক্রে ভগবানই ভূত। তসলিমাও হঠাৎ দশভূজার মতো বিশ্বাসের মণ্ডপে উঠেছে। হরকাতুল জেহাদীরাও এখন তাকে 'মা দুর্গা' বলে ডাকছে। কোনও অর্ধসত্যই নেই ক-এ, সেকথা বলছি না। তবে বিক্রির জন্য বইটিকে অতিরিক্ত যৌনগন্ধী করতে গিয়ে অনেক পূর্ণমিথ্যাও বলেছে তসলিমা। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। কিছু-কিছু ব্যাপারে রীতিমতো পুকুরচুরি করেছে সে। অর্ধসত্যের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। আমার অর্ধসত্যগত ব্যাখ্যায় বইটাকে চোরাকাহিনীও বলা যেতে পারে। তসলিমা বলেছে, এটা তার আত্মজীবনী। আমাদের সময় 'একটি পয়সার আত্মজীবনী', 'একটি বটগাছের আত্মজীবনী' রচনা মুখস্থ করতে হত স্কুলে। মেডিকেলে তসলিমা আর আমি একবছর একসঙ্গে পড়েছি। ছেলেবেলায় হরলাল রায়ই ছিলেন ওর সবচেয়ে প্রিয় লেখক, একাধিকবার একথা বলেছে আমাকে। 'একটি চোরের আত্মজীবনী' লিখতে সম্ভবত হরলাল রায়ই তাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবেন। আর উদ্বুদ্ধ করেছে মিডিয়া।

মিডিয়ার সেই একচ্ছত্রতা এখন আর নেই। ইরাকযুদ্ধে সিএনএন আর বিবিসিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল আল জাজিরা। মিডিয়ার চোর-পুলিশ খেলায় বুশ-ব্লেয়ারকে হার মানিয়েছিলেন সাদ্দামের তথ্যমন্ত্রী সায়ীদ আল সাহাফ। মিডিয়া যে চোরের সিঁদকাঠি, সে-কথা সারা পৃথিবীই এখন জানে। চোর নিয়ে বাংলাসাহিত্যের প্রথম বহুলআলোচিত উপন্যাস মনোজ বসুর *নিশিকুটুম্ব*। সে-উপন্যাস নফরকেষ্ট চোরকে নিয়ে লেখা। লেখকের মতে– "একটা চোরের কথা কেউ যদি ভালো করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়।" যেহেতু তসলিমাকে আমি ওর সিঁদকাঠিসমেত চিনি, তসলিমার কথা লিখলেও সবার জীবনীই লেখা হয়। তসলিমার *ক* আত্মজীবনী। আত্মজীবনী হচ্ছে একরৈখিক আধুনিক যুগের দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন বহুরৈখিক উত্তরআধুনিক যুগ চলছে। এখন লিখতে হবে সমাত্মজীবনী– ঝাঁপি খুলব একজনের, বেরিয়ে আসবে অনেকের অর্ধসত্য। জগতে যেহেতু পূর্ণসত্য বলে কিছু নেই, ঐ অর্ধ-অর্ধ সত্যগুলো নিয়েই আমাদের সামষ্টিক জীবনী।

গ্রামবাংলার চোরের গল্পটি আরও মজার। তসলিমার সঙ্গে হবহু মিলে যায়।– সিঁদকাঠিসমেত ধরা পড়েছে এক চোর। গ্রাম্য সালিশে সাব্যস্ত হল– নাক কেঁটে চোর-বেটাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। চোর দেখল, মহা বিপদ! পাবলিকের মাথায় সিঁদ না-কাটলে এ-যাত্রা রক্ষে নেই। অতএব তাৎক্ষণিকভাবে একটা শ্লোক রচনা করল চোর–

নাক কাটিলে হবে ডালে-পালে
চুল কাটিলে না-হবে ইহকালে।

পাবলিককে যারা বোকা বানাতে পারে, তারাই ভালো থাকে দুনিয়ায়। গল্পের চোরটিও পারল। চোরের শ্লোক শুনে সালিশের মোড়লদের মাথায় হাত। সে-মাথায় চুলও ছিল; কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ছিল না। নাক কাটলে ডালপালাসমেত গজাবে? তাহলে তো চোরেরই লাভ। অতএব চোরের কথা মতো তার চুলই কেটে দেওয়া হোক। ইহকালেই আর গজাবে না সে-চুল।

বোকা মোড়লদের দেশ বাংলাদেশ। অর্ধসত্যকেই তাদের যত ভয়। একবার মৌলবাদী মোড়লরা চোরের শ্লোকে বিভ্রান্ত হয়েছিল; এবার প্রগতিশীল মোড়লরা। ফতোয়া দিয়ে তসলিমাকে দেশ থেকে তাড়ানো আর মামলা ঠুকে তার বই নিষিদ্ধ করার মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। লাভ তসলিমারই। বিনাখরচায় চুল বয়কাট করিয়ে নিল দুইবার। এই সব গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লদের মোড়ল বানিয়েছে আমাদের মিডিয়াই।

মিডিয়াকে পাত্তা দেন না মার্কিন চিন্তাবিদ চমস্কি। মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরে জেলও খেটেছেন তিনি। আজ নিজেই চমস্কি মিডিয়া। মার্কিন পুঁজির সঙ্গে ফরহাদ মজহারের আঁতাতের সমালোচনা করেছে তসলিমা তার ক-এ। কিন্তু বুশের একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরার সাহস তার নেই। কারণ বুশ-পৃথিবীই তার আরাধ্য। ধর্মের উচ্ছেদ নয়, বুশ-ব্লেয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তসলিমা শুধু মুসলিম-মৌলবাদেরই উচ্ছেদ কামনা করে। আফগানিস্তান-যুদ্ধে বুশ যখন ক্রুশেডের ডাক দিয়েছিলেন, তসলিমা তখন খ্রিস্টান-মৌলবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেনি। মৌলবাদী ইহুদীদের প্রতিও সে সহানুভূতিশীল। মৌলবাদ মৌলবাদই। মুসলিম-মৌলবাদের চেয়েও মানববিশ্বের জন্য এখন ইহুদী+খ্রিস্টান-মৌলবাদ বেশি বিপজ্জনক। যতই যৌনগন্ধী হোক তসলিমার লেখা, মৌলবাদী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপরে তা একেবারেই কামশীতল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তসলিমার লেখার পাঠক অনেক, কিন্তু তার ভক্তের সংখ্যা নগণ্য। এর কারণ আর কিছুই নয়– স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নেই তার লেখায়। যৌনস্বাধীনতা চাইলেও সমকামকে সে একটি অপরাধ বলেই মনে করে। তাইওয়ান সমাজে সমকামিতা এখন নিষিদ্ধ কিছু নয়। সমকামীদের জন্য প্রতিদিন দু ঘণ্টার বেতার-অনুষ্ঠানও হয় সে-দেশে। ব্রিটেনে সমকামী জুটির একজন মারা গেলে অন্যজন পেনশনের অংশ পায়। হাঙ্গেরীতে সমকামী বিয়ে বৈধ। নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যাণ্ডে পুরুষে-পুরুষে নারীতে-নারীতে বিয়ে সমাজস্বীকৃত। সম্প্রতি বাংলাদেশের দুই সমকামীকে অস্ট্রেলিয়া সরকার সে-দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখের *ইত্তেফাকে* বিবিসি-র বরাত দিয়ে সেই সংবাদ ছাপাও হয়। আমেরিকার সানডিয়াগো শহরেও কয়েক বছর আগে মেয়র সুজান কোলডিং-এর শুভেচ্ছা-বাণী নিয়ে সমকামীদের বর্ণাঢ্য উৎসব হয়ে গেছে। সেই উৎসব ঘুরে এসে প্রয়াত নাজিম মাহমুদ 'চোখ যায় যদ্দূর' শিরোনামে একটি গদ্য লিখেছিলেন *খোলাজানালায়*। "ঈশ্বর কাউকে বি-সমকামী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; কাউকে সমকামী করে– তাহলে সমকামিতাকে অপরাধ মনে করছ কেন তোমরা?"– সানডিয়াগো শহরের সেই উৎসবে যোগদানকারীরা এই অর্ধসত্যই তুলে ধরেছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে। অথচ বান্ধবীর সমকামিতাকে ভালো লাগেনি তসলিমার চোখে। সিকদার আমিনুল হকের শেষ কাব্যগ্রন্থে সমকাম এসেছে। গত শতকের ছয়-এর দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিট কবিরা তো প্রেমের কবিতা বলতে সমকামের কবিতাই বুঝতেন। সিকদার আর বিট কবিদের মতো সংস্কারমুক্ত মন তসলিমার কাছে আশা করাও বোকামি। *হাংরির* কবিরা সেই কবে তাদের মেনিফেস্টোতে বলেছিলেন– "আমরা মুখ আর পোঁদ দুদিক দিয়ে কথা বলি না।" কিন্তু তসলিমা বলে। একদিকে সে যৌনস্বাধীনতা চায়, অন্যদিকে সমকামিতাকে বাঁকা চোখে দেখে। না তার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা আছে, না যৌনস্বচ্ছতা।

এমন অসংখ্য বিরোধাভাসের সমবায় তসলিমার ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোড়াতে-পোড়াতে ছাই ওড়াতে-ওড়াতে চলে যাই

মিডিয়াকে আমি প্রায় তিরিশ বছর আগে বিয়ে করলেও ঘর করেছি তার সঙ্গে বারো কী তেরো বছর। ১৯৭৫ সালে আমি কুমিল্লার *আমোদ* নামের একটি সাপ্তাহিক কাগজে কিছুদিন ছোটদের পাতা সম্পাদনা করেছিলাম। অবৈতনিক। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। সেই আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। তারপর বিভিন্ন সময় আমি ঢাকার বিভিন্ন কাগজে কাজ করেছি। তো, ঐ বিয়ে আর ঘর করার কথাটি আমি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ যাওয়ার পথে কুষ্টিয়ায় এক আনসারের মুখ থেকে শুনেছিলাম। রিক্রুটমেন্টের বয়েস এগারো হলেও তিন দফায় মাত্র আঠারো মাস বেতনভুক সরকারি কর্মচারি ছিল সেই আনসার। এদেশের অধিকাংশ রিক্রুটেড আনসারের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতাই এই। যখন চাকরি থাকে না, কী করে তারা?– গড়াইয়ের ফেরিঘাটে চা খেতে-খেতে জানতে চেয়েছিলাম আনসারের কাছে।– যাদের জোতজমিন আছে, তারা চাষবাস করে খায়; যাদের তা নেই, তারা ডাকাত দলে ভিড়ে যায়। ট্রেনিং তো সঙ্গেই আছে; অস্ত্রই না শুধু জমা দিয়ে এসেছে সরকারকে।

সারাজীবনে আমি একটাই ট্রেনিং ভালোভাবে নিয়েছি– চাষবাসের ট্রেনিং। একটাই লাঙল আছে আমার– কলম। দিস্তা-দিস্তা শাদাকাগজই তার জোতজমিন। যখন বেকার থাকি, তখন সেই জমিনে চাষ করি আর নদী ও নদীতীরবর্তী জনপদে ঘুরে বেড়াই। মামুন হুসাইন কুষ্টিয়ার ছেলে। শিলাদহ যাওয়ার সময় মামুনও আমার সঙ্গে ছিল। ওর ছোটগল্পের আমি ভক্ত। আমার শ্যালিকাকে বিয়ে করে 'ভায়রা ভাই' হওয়ার আগ থেকেই ভক্ত। কিন্তু মামুন যদি আমার সঙ্গে শিলাইদহ যায়ও, সেকথা আমার লেখায় আনা যাবে না– কারণ সে আমার ভায়েরা ভাই। মামুনের গল্প যদি আমার ভালো লাগেও, সে গল্পকে ভালো বলা যাবে না– কারণ সে আমার শ্যালিকার বর। যদি এর অন্যথা হয়, খোন্দকার আশরাফ তার *একবিংশে* আমার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখবে। বন্ধু-বান্ধবদেরও অনেকে মজা পাবে সেই সম্পাদকীয় পড়ে। কোন বন্ধুবান্ধব? *খোলাজানালায়* যাদের লেখা ছাপিয়েছি বলেও আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তাদের লেখা নিয়ে গদ্য লিখেছি বলেও আছে। আমার সমস্যা যার লেখা ভালো লাগে, তাকেই আমার বন্ধু মনে হয়। মার্কিন কবি ডব্লিউ.এস. মারউইনকেও মনে হয় তার *রিভার সাউন্ড* বইটি পড়ার আগ থেকেই। 'সেপারেশন' নামের মাত্র তিন লাইনের একটি কবিতা পড়েই তাকে বন্ধু জেনেছিলাম। ইংরেজ কবি ডি. জে. ইনরাইটকেও বন্ধু মনে হয়েছিল তার *আন্ডার দ্য সারকামসটেন্সেস* পড়ে। দুটি কবিতা অনুবাদও করেছিলাম এই কবির। হ্যারিট মনরোর *পোয়েট্রি* পত্রিকায় দেখলাম, কিছুদিন আগেই লোকান্তরিত হয়েছেন এই কবি। ১৯৯৭ কি ৯৮ সালে আইওয়ার অনুবাদ বিভাগের ডিন ক্যারোলিন ব্রাউন ঢাকায় এলে *মুক্তকণ্ঠের খোলাজানালা*তেও এসেছিলেন। আমি তার একটা সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। সেটা শুরু হয়েছিল *মুক্তকণ্ঠ* অফিসে, শেষ হয়েছিল শামসুর রাহমানের শ্যামলীর বাড়িতে। ক্যারোলিনেরও প্রিয় কবিদের একজন মারউউন। ইনরাইটের নাম শুনলেও তখনও তার কোনও বই পড়েননি তিনি। মারউইনকে আমার বন্ধু বলায় ক্যারোলিন খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আর কী। অথচ মারউইনকে আমি চোখেই দেখিনি। হাওয়াই দ্বীপে থাকেন। দ্বীপবাসী এক বন্ধুকে নিয়ে ক্যারোলিন আর আমার সেই আনন্দ খোন্দকার নিজের চোখে দেখলে গত শতাব্দীর দীর্ঘতম সম্পাদকীয়টিই লিখে ফেলত। খোন্দকারদের মতো ঈর্ষাকাতররা মানুষের মধ্যে ভালো কিছু খুঁজে পায় না। সবসময় খারাপই দেখে। এদের মতো একচক্ষুদের জন্যই অর্ধসত্যের বদলে পূর্ণমিথ্যারই ছড়াছড়ি আমাদের চারপাশে।

ঘরের যোগ্যদের কদর নেই আমাদের দেশে। নোবেল-বুকার ঘোষিত হওয়া মাত্রই হইচই শুরু করি আমরা। অন্যদিকে দেশের বড় লেখকদের মৃত্যুর পর সম্মান করি। এইসব বুদ্ধির ঢেঁকিদের আমি ছেঁড়া দু-টাকাও পাত্তা দিই না। কার মেধার বহর কত, তা দু লাইন গদ্য পড়েই বলে দেওয়া যায়। দুমিনিট কথা বলেই। এই ভানসর্বস্ব বুদ্ধির ঢেঁকিদেরই আবার অনেক লেখক ভয় পান। এদের কারণে অনেকের লেখালেখিরও মৃত্যু ঘটে। ঘটাই উচিত। নিজেকে যে-লেখক বাঁচাতে জানেন না, তিনি দেশকে, পৃথিবীকে কী বাঁচাবেন? সজনীকান্ত দাশও *কল্লোল*-প্রগতির লেখকদের পেছনে লেগেছিলেন। ফায়দা হয়েছে কিছু? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাকে খলনায়ক হিসেবেই দ্যাখে। বুড়ো বয়েসে সজনীকে ক্ষমাভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছিল দ্বারে-দ্বারে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাছেও ক্ষমা চাওয়ার কথা মনে হয়েছিল তার। শিবনারায়ণ রায়ের কাছে সেই ইচ্ছেই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব আর তার সতীর্থ কবিদের কম তো জ্বালাননি সজনী তার যৌবনে। *শনিবারের চিঠি* বেরই করতেন সৃষ্টিশীল কবি-লেখকদের উত্যক্ত করার জন্য। জীবনানন্দ দাশের মতো নির্জন কবিকেও তুলোধুনো করেছে পত্রিকাটি। বুদ্ধদেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

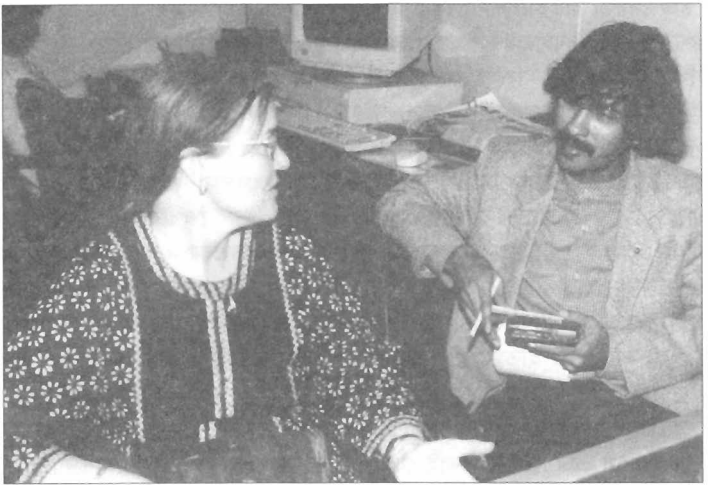

আইওয়ার ক্যারোলিন ব্রাউনের সঙ্গে *খোলা জানালার* অফিসকক্ষে

ধ্রুব এষের সঙ্গে নিজগৃহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার *কবিতা* পত্রিকায় *শনিবারের চিঠি*র জবাব দিতেন। বুদ্ধদেব আগেও টলেননি– পরেও না। শিবনারায়ণ বুদ্ধদেবকে সজনীর শেষ-ইচ্ছে জানালে বুদ্ধদেব ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, "বুড়ো বেশ্যার ঢং দেখে বাঁচি না। মরার আগে হরিনাম।" –বুদ্ধদেবের এমতকাঠিন্যে শিবনারায়ণ বাঙালিসুলভ কষ্ট পেয়েছিলেন। পেটের দায়ে যারা বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বুদ্ধির বেশ্যারা ক্ষমার অযোগ্য। শিবনারায়ণ কষ্ট পেলেও আমি বুদ্ধদেবের মধ্যে সাহস দেখি। আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই ভাগ লেখকেরই এই সৎসাহস নেই। অধিকাংশই তারা দাসস্বভাবী। একশ' জনে যে-একজন নন, তাকেই পাঠক খোঁজেন। সাহিত্যচর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন বলেই আজীবন সাহিত্যের ক্ষতিসাধনকারী সজনীকান্তর ক্ষমাপ্রার্থনায় বুদ্ধদেবের মন গলেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর মতো সম্পাদক কমই এসেছেন। শুধু নিজেকেই তিনি রক্ষা করেননি, জীবনানন্দ দাশের মতো সৃষ্টিশীল কবিদেরও প্রোটেকশন দিয়েছেন। আহসান হাবীবও বড় সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের সেই সাহস তার ছিল না। তাই যোগ্যতা থাকার পরও মঈনুল আহসান সাবেরের লেখা ছাপাতেন না তিনি *দৈনিক বাংলায়*। কেন? মঈনুল আহসান সাবের তার ছেলে। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্যসূচিতে আমার একটি কিশোর-কবিতা মনোনয়ন করেছিল সেই তিরাশি-চুরাশি সালে। বোর্ডের সেক্রেটারি আবদার রশীদ আমাকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকথা জানিয়ে। আবদার রশীদ ভালো অনুবাদক ও নামি ছড়াকার। কিন্তু না, লেখাটি পাঠ্যবইয়ে মুদ্রিত হয়নি। কেন? আমার বাবা প্রফেসর মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন সে-লেখা বাদ দিয়েছিলেন। তিনি তখন টেকস্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আমি তার ছেলে। ছেলের লেখা রিভিউয়াররা ছাপার যোগ্য মনে করলেও তিনি দায়িত্বপালনে তার সিনসিয়ারিটি দেখিয়েছেন। ছেলের লেখা ছাপার যোগ্য হলেও আমার বাবা কিংবা আহসান হাবীব তা ছাপাতেন না লোকনিন্দার ভয়ে। লেখা ভালো হলে ছেলের লেখা, ভায়রার লেখা আর বন্ধুর লেখা– সবার লেখাই ছাপানো যায়। না-হলে কারও লেখাই না।– আমি এরকমই বুঝি।

'কন্সপিরেসি অব সাইলেন্সে'র দেশ বাংলাদেশ। নিজে পেতে চান; অন্যকে পেতে দেখলেই চোখ টাটান– এই হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকাংশ কবি-লেখকের চরিত্র। *খোলা জানালার* একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। চট্টগ্রামের ময়ুখ চৌধুরীকে অনেকদিন ধরে ঢাকার বড়কাগজগুলো অবহেলা করে আসছে বলে আমি তাকে নতুন করে লাইম লাইটে নিয়ে আসি। কবিতা তো ভালোভাবে ছাপিই তার, 'কবিতার পাড়াপ্রতিবেশী' শিরোনামের একটা ধারাবাহিক লেখাও প্রকাশ করতে শুরু করি। এইসময় *খোলা জানালায়* চট্টগ্রামের আবুল মোমেনের সাক্ষাৎকার ছাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে ঈর্ষাকাতর হয়ে ময়ুখ কিছু কথা বলেন আমাকে। মামুন হুসাইনের গল্প বেশি না-ছাপানোরও পরামর্শ দেন। কেন?– ময়ুখের সংলাপের আগে আবুল মোমেনের সংলাপ ছাপা হলে চট্টগ্রামের পাঠক হাসাহাসি করেন। কেন?– আমার ভায়রা ভাই মামুন হুসাইনের গল্প ছাপি বলে চট্টগ্রামের সবাই কানাঘুষা করেন। সবাই ময়ুখ চৌধুরীর কাছে এসেই হাসাহাসি আর কানাঘুষা করেন? তার সঙ্গে চট্টগ্রামের এত মানুষের যোগাযোগ? কথাগুলো যে ময়ুখের নিজেরই– সে-কথা বোঝার বয়স আমি অনেক আগেই পাড়ি দিয়ে এসেছি। অগত্যা ময়ুখকে না বলে পারি না– "বন্ধুর ধারাবাহিক লেখা ছাপছি বলে আপনাকে নিয়েও একইরকম অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে।"– এরপর ময়ুখ আর কথা বাড়ায় না। *খোলা জানালায়* তারও সাক্ষাৎকার ছাপাতে চাই শুনে হাসিও ফোটে মুখে।

আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এই ঘটনা হাশেম খানের। তিনি ছোটদের বইয়ের প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন এঁকেছেন অনেক। নাম-ডাকও কম নয়। তবু নামের কাঙাল। দৈনিক মুক্তকণ্ঠের উদ্বোধনী সংখ্যাটি করার ভার পড়েছিল আমার ওপর। সহযোগী হিসেবে সঙ্গে ছিল জুয়েল মাজহার, শহিদুল ইসাম রিপন আর গুপু ত্রিবেদী। নেপথ্যে প্রি-প্রেস কাজের তদারকি করেছে গ্রাফিক স্ক্যানের মানবেন্দ্র সুর। সেই সংখ্যার তিনটি ফোল্ডারের প্রচ্ছদ তিনজন শিল্পী করেছিলেন। তাদের দুজন– হাশেম খান ও ধ্রুব এষ। এক-একটি ফোল্ডার ১৬ পৃষ্ঠার। তিন দিন পর-পর ছাপা হচ্ছে। হাশেম খানের প্রচ্ছদটি গেল প্রথম ফোল্ডারে। জলরঙে আঁকা বাংলাদেশ। ডিজাইনের নিচে হাশেম খানের স্বাক্ষর আছে। ভাবলাম, আলাদা করে আর ৬ পয়েন্টের ক্রেডিট লাইন দিয়ে কাজ নেই; সবার প্রচ্ছদ শুধু স্বাক্ষরেই যাক। কিন্তু গোল বাঁধালো ধ্রুব এষ। মানবেন্দ্রর হাতে লে-আউট ধরিয়ে দিয়ে ধ্রুব সিলেট চলে গেল ৭ দিনের জন্য। প্লেট করার আগে লক্ষ করলাম, বার-বার অনুরোধ করার পরও স্বাক্ষর রেখে যায়নি ধ্রুব তার লে-আউটে। অগত্যা প্রচ্ছদের নিচে ৬ পয়েন্টের ক্রেডিট লাইনে ধ্রুব এষের নাম গেল। পত্রিকা বাজারে আসার পর এই ঘটনায় এতই ক্ষিপ্ত হলেন হাশেম খান যে, তাকে শান্ত করতে আমার আধ ঘণ্টারও বেশি সময় গেল টেলিফোনে। যতই বোঝাই 'আপনার ছবির নিচে তো স্বাক্ষর আছেই', ততই তিনি ধ্রুবর ছবির নিচের 'ক্রেডিট লাইন' দ্যাখান। যতই ক্ষমা চাই এই অনিচ্ছাকৃত বৈষম্যের জন্য, ততই তিনি তার সর্বনাশের কথা বলেন। কী সর্বনাশ? কেউ জানবে না, ছবিটা কার। বলতে ইচ্ছে করেছিল– "এত বছর হয় আঁকাআঁকি করেছেন, ছবি দেখেই তো সবার বলে দেওয়া উচিত, কাজটা কার। তাছাড়া স্বাক্ষর তো আছেই নিচে। যামিনী, জয়নুলের ছবি থেকে তো ঐ স্বাক্ষরটুকু মুছে ফেললেও আমরা চিনি। আমার জানা ছিল না যে ছবি মুছে শুধু নাম ছাপালেই আপনি খুশি হন। জানলে ১১০ পয়েন্টে শুধু নামই ছাপাতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে পারিনি কথাটা। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি, তুলকালাম কাণ্ড। আমি ছাড়াও বেবী মওদুদ, জাফর ওয়াজেদসহ আরও অনেকেই ব্যাপারটা জানেন। মানে একই ফোন প্রচ্ছদশিল্পী আরও অনেককে করেছেন। ধ্রুব এষের যেখানে মনেই থাকে না ছবিতে ওর নাম গেল কি গেল না, হাশেম খান সেখানে স্বাক্ষরেও সন্তুষ্ট নন। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। ঘটনাটি আমার কবিতায় প্রভাব ফেলেছিল। পুঁথির ছন্দে লেখা তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছিল এমন–

কত অজানার ডালে না-জানার ফুল
ফুটিয়া ঝরিয়া যায় কে দেবে মাশুল
কত গুহাচিত্রে কত ছবির টোটেমে
আদিচিত্রকরগণ মগ্ন ছিল প্রেমে
তাহাদের কিবা নাম কিবা পরিচয়
কেহ না জানুক তারা চিত্রে কথা কয়
আমিও তাদের ভাই কালের ধীবর
সমকালে থাকি আর ঘুরি কালান্তর॥

মুক্তকণ্ঠের খোলা জানালা সম্পাদনার মাধ্যমে বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের সম্পর্কে। ইচ্ছে আছে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে কখনও বিশদে লেখার। *খোলা জানালা* ছাড়াও আমার তিন দশক বিস্তারী লেখকজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি– খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ময়ুখ চৌধুরী আর হাশেম খানের মতো ঈর্ষাপরায়ণদের সংখ্যাই আমাদের চারপাশে বেশি।

"খোন্দকার মোশতাকের নাম শুনেছি; খোন্দকার আশরাফের এই প্রথম শুনলাম। দুই খোন্দকারই দেখছি একইরকম।"– শীর্ষেন্দুর ভূত আমার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে বসে ফিসফিস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত না লেখায় বড় সমকাল, তারও বেশি নামের বহরে

যখন লোকে জানে, আমি বেকার, কিছুই করি না– তখনই আমি সবচেয়ে বেশি করি। দেশের এক প্রত্যন্ত থেকে আরেক প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াই এবং ফিরে এসে শাদাকাগজের জমিনে চাষবাস করি। ভাঁড়ারে যে শস্য ওঠাই, তার কিছু খরিদ্দারও আছে। তলে-তলে তাদের সংখ্যা বাড়ছে বলে ইদানীং প্রকাশকরাও পাণ্ডুলিপি চেয়ে তাগাদা দেন। কেউ-কেউ আগামও ধরিয়ে দিয়ে যান হাতে। বড়কাগজে আর না-লিখলেও আমার পাঠকরা আমাকে ছোটকাগজ থেকে, বই থেকে ঠিকই খুঁজে নেন। কবিতার বাইরে আমার গদ্যেরও কিছু পাঠক আছেন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে। তো, 'কবিতার বাঁক অথবা বাংলা কবিতার ৫০ বছর' নামে সে-রকমই একটা গদ্য আমি দুই-তিনমাস খেটে তৈরি করেছিলাম। বাংলা কবিতার গত পঞ্চাশ বছরের বাঁকগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম সেই গদ্যে। সেটি *অমিত্রাক্ষর*-এর 'নিরঙ্কুশ কবিতা সংখ্যা'য় ছাপা হয়েছিল। দ্রুতই সব কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ঐ সংখ্যা *অমিত্রাক্ষর*। সেই গদ্যে যাদের নামই নিতে পারিনি, তারা আমার ওপর ক্ষুব্ধ হন। যাদের কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিনি– তারাও। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু আসাদ মান্নান, আমি বললেই যে আব্দুল্লাহপুর ঘাটে বজরা নিয়ে উপস্থিত হয়, সে-ও শেষোক্তদের একজন।

একসন্ধ্যায়, আজিজ মার্কেটের আড্ডায় আসাদ মান্নানের চেপে রাখা ক্ষোভ অতর্কিতে আমার দিকে ছুটে এল– "তুমি কত বড় কবি তুমি নিজেও জানো না; কে তোমাকে এইসব আজেবাজে গদ্য লিখতে বলেছে? তোমার কাজ শুধু কবিতা লেখা; আর কিছু না।"

যেন ভরণপোষণের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আসাদ আমাকে এই কথা বলছে। যেন সে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর আমি বগলে *বিদ্যাসুন্দর* নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতচন্দ্র। লক্ষ করলাম, কবি-চরিত্রের খোলস ভেঙে আসাদের আমলা-সত্তা বেরিয়ে আসছে। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সবার সামনে এমন ভাব দ্যাখাচ্ছে– শাহরিয়ারকে সে এক ধমকে আজিজের বারান্দায় শুইয়ে দিতে পারে। যেন জঘন্য একটা অপরাধ করেছি আমি কবিতা নিয়ে ঐ গদ্যটি লিখে– তাই এই ধমক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণত আমি এইসব ক্ষেত্রে চুপ থাকার পাত্র নই; কিন্তু সেদিন স্বর নিচু করে আসাদকে আরও একটু আমলা হওয়ার সুযোগ দিলাম– "আমি কত বড় কবি, সেটা তুমি মুখে-মুখে জানলেই হবে। কিন্তু অন্যরাও কত বড় কবি, সেটা লিখে জানানোকে আমি কর্তব্য বলে মনে করি। তাই ঐ গদ্যটা লিখেছি।"

আমার এই কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে আসাদ আরও এক কাঠি সরেস হয়ে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে বসল যে আমি থ মেরে গেলাম– "মালাউনের বাচ্চা জয় গোস্বামী তোমার কাছে এত বড় কবি হয়ে গেল?"

শুধু জয়কে নিয়ে ঐ প্রবন্ধ আমি লিখিনি; সেখানে শামসুর রাহমান থেকে রহমান হেনরী পর্যন্ত অনেক-অনেক কবির প্রসঙ্গ এসেছে কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ। কিন্তু, একী শুনছি আমি আসাদের মুখে! জয় গোস্বামী 'মালাউনের বাচ্চা'? আর সে-কথা সমুদ্র গুপ্তও হাঁ করে শুনছেন, মুসলনমানের ছেলে হওয়ার পরও নামের কারণে অনেকেই যাকে 'মালাউনের বাচ্চা' ভাবেন?

আসাদ খুব ভালো করেই জানে, কোনও ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার জন্য আমি আমার লেখায় কারও নাম নিই না। জয়েরও নিইনি। একসময় *দেশ* পত্রিকায় জয়-সুনীল আমার অনেক লেখা ছাপালেও সে-পত্রিকা এখন আমি পুঁছি না। পুঁছি না মানে পুঁছিই না। শামসুর রাহমানের সঙ্গে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কবিতা কালার পেজে ছাপিয়েছে জয় গোস্বামী। 'বাংলাদেশে আমিই ওর একমাত্র বন্ধু' জানিয়ে চিঠি লিখেছে। ১৯৯৮ সালে *দেশ* পত্রিকার যে সংখ্যাটি বদরুদ্দীন উমরের লেখার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, শামসুর রাহমান আর আমার কবিতা দিয়ে বাংলাদেশের কবিতা লিড করেছিল জয়। এই দুজনের লেখাই শুধু ছেপেছিল সে রঙিন পাতায়। সংখ্যাটিতে রফিক আজাদ, বেলাল চৌধুরী আর ফরহাদ মজহারসহ বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতা ছিল। লেখা রঙে না শাদা-কালোয় ছাপা হল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। সেই সমস্যা ফরহাদ মজহারের আছে। *খোলা জানালায়* কবিতা রঙিন পাতায় ছাপিনি বলে একবার তিনি ক্ষেপেছিলেন খুব। কিন্তু আমি ফরহাদ মজহার নই বলে জয় আমার কবিতা পছন্দ করলেও *দেশ* পত্রিকার রঙে এখন আর ভুলি না। ভুলি, হুগলি থেকে চল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত ছোটকাগজ *সাহিত্য সেতু*র ডাকে। উদ্যোক্তারা বিমানের টিকিট পাঠাতে চাইলেও আমি নিজের খরচে কলকাতায় যাই। আমাকে আর আমার প্রিয় ছোটগল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে একই বছর পুরস্কৃত করেছিল এই *সাহিত্য সেতু*। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ রবীন্দ্র সদনের বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে স্বপ্নময় এবং নবনীতা দেবসেনের হাত থেকে আমি পুরস্কারের সনদ, ক্রেস্ট ইত্যাদি গ্রহণ করেছিলাম। অর্মত্য সেনের প্রাক্তন স্ত্রী নবনীতা। আমার প্রিয় কবিদেরও একজন। তার হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে আমার ভালো লেগেছিল। স্বপ্নময় আর আমাকে একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যোগ্য মনে করাতেও। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত তখন বেঁচে আছেন। আমার কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মঞ্জুষ 'জন্ম যার নিসর্গতায় পদ্য তার পায়ে গড়ায়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। মন্তব্যসূচক নিছক প্রশংসা ছিল না বলে, সেই লেখাটিকেও অনেক বড় প্রাপ্তি মনে হয়েছিল। এতসব প্রাপ্তির পর পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমি কী করব ? *সাহিত্য সেতু*র তহবিলেই ভালবাসাস্বরূপ জমা রেখে এসেছিলাম সেই অর্থ। সম্পাদককে বলেছিলাম– "আমি জানি, কত কষ্টে আপনারা ছোটকাগজ করেন। এই টাকা আমি নিতে পারব না।" এখনও বিনামূল্যে কাগজটি নিয়মিত আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে *সাহিত্য সেতু*র জগবন্ধু কুণ্ড সেই ঋণ স্বীকার করেন। মেদিনিপুর কবিতা উৎসব ১৯৯৯-এ আমার কবিতা শুনে এক মাটির কুমোর আমাকে প্রাণের গণেষ উপহার দিয়েছিলেন। মাটির সেই গণেষ মূর্তিটিই আমার কাছে অনেক বড় পুরস্কার। *ধাবমান সাহিত্য আন্দোলন* আমাকে সাহিত্য-সম্পাদনার জন্য সম্মাননা ও ক্রেস্ট দিয়েছিল। সেই সম্মাননাই আমার কাছে অনেক। অনেক প্রান্তিকের সংগঠন আমাকে ক্রেস্ট, পুরস্কার ইত্যাদি দিয়েছে। সেইসব ভালোবাসা আমি একটাই শর্তে গ্রহণ করেছি– তার কোনও প্রেসরিলিজ বড়কাগজে পাঠানো যাবে না। বড়কাগজ যদি নিজে থেকে সেই অনুষ্ঠানের খবর ছাপায়, তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ প্রচারের জন্য মিডিয়ার কাছে কাছে হাত-পাতাকে আমি অসম্মানজনক মনে করি। আবার এও বুঝি, এ-জাতীয় অনুষ্ঠান যারা করেন, তারা চান, তাদের অনুষ্ঠানের খবর সারাদেশের মানুষ জানুক। তাই আমন্ত্রণপত্রে ঢাকার প্রচারপটুদের ভিড় দেখে *ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদে*র সাহিত্য-সম্মেলন ২০০২-এ যেতে ইচ্ছে না-করলেও *আজকের কাগজে*র প্রথম পাতায় অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে মন্তব্য-প্রতিবেদন লিখতে ভুলি না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে ধার করে শিরোনাম দিই– 'আজ কোথায় যাবেন'। সে-প্রতিবেদন পড়ে *ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদে*র সাধারণ সম্পাদক ইয়াজদানী কোরাইশী আমাকে ফোন করেছিল অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই। শামসুজ্জামান খানও আমার প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কলাম লিখেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই। এ-খবরগুলো আগে আমাদের দৈনিকে প্রথম পাতাতেই আসত; এখন আসে না– এই আক্ষেপ থেকেই তিনি কলম ধরেছিলেন। বাংলাদেশে এখনও যারা নিজেদের উদ্যোগে আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের খবর প্রচারে আমাদের মিডিয়ার কোনও উৎসাহই নেই। এই অনাদরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও আমি গদ্য লিখি। অসংখ্য-অজস্র ভাঁটের গল্প লিপিবদ্ধ করতেও গদ্য লিখি। সেই গদ্য-লেখাই আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে আসাদের একটিমাত্র কথায়?

জয় কবি। আসাদও কবি। কবি মানুষ বুঝবে– হিন্দু-মুসলমান নয়। অতএব আমিও আমার চিরাচরিত দার্ঢ্য নিয়ে আসাদকে বলি– "তোমাকে কবি ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে এখন। কাদের মতো কথা বলছ তুমি, জানো? যারা 'মালাউন'দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িঘর লুট করে এবং 'মালাউন' মেয়েদের রেপ করে প্রকাশ্যে, তাদের মতো।"

কিন্তু সবাই এক হলে জগতের চলে না। হামীম কামরুল হক আমার ঐ গদ্যের খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরে গদ্য লেখে। যার নাম লেখাটিতে নেই, সেই হেনরী স্বপন অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখে। লেখাটি ছেপেছে যে-আমিনুর রহমান সুলতান, তার নামও নেই। কলকাতা থেকে সুজিত সরকার আর মুন্সীগঞ্জ থেকে *আপাতত* পত্রিকার সম্পাদক কাজী মহম্মদ আশরাফও লেখাটি সম্পর্কে চিঠিতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। সুজিত লেখে– "কবিতার জন্য আপনার এই ত্যাগ আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।" আশরাফ আক্ষেপ করে– "আপনার এই বিশাল প্রবন্ধের ব্যাপারে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বিনয়বশত, নিজের কথা অনুল্লেখ করেছেন। অন্তত নির্মোহভাবে কিছু কথা বলা উচিত ছিল আপনার কবিতা সম্পর্কে।"

ঠিকই ধরেছে আশরাফ– আমি নিজেকে নিয়ে লিখিনি ঐ গদ্য। লিখেছি আমার প্রিয়-প্রিয় কবিদের নিয়ে। দশকবিচারী প্রাবন্ধিকদের মতো শুধু নামের তালিকা দিয়েই খালাস পেতে চাইনি। যাদের কথা যে-প্রসঙ্গে বলেছি, তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পেশ করারও চেষ্টা করেছি। উদ্ধার করেছি আমার কাছে মনে-হওয়া সেরা-সেরা কবিতার পঙ্‌ক্তি। পনেরোবার প্রুফ দেখেছি সে-লেখার। শুধু প্রুফের জন্যই কালজয়ী কম্পিউটার্সে অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা গুনতে হয়েছে কাগজটির সম্পাদককে। অথচ কত সহজেই না আসাদ আমাকে গদ্য লিখতে বারণ করে দিল আজিজ মার্কেটে। আমি জানি, ভাগ্যে কম পড়লে সবাই আসাদের মতোই আচরণ করে। যাদের ভাগে কিছুই ওঠে না, তারা আসাদের চেয়েও বেশি করে। কিন্তু আমার গুণবিচারী কলমে সব বন্ধুকেই আমি সন্তুষ্ট করতে পারি না। যারা আমার বিরুদ্ধে বদনাম রটিয়ে বেড়ায়– ভালো লাগলে আমি তাদের লেখারও প্রশংসা করি। সবাই কালের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু কালের মুখও নেই, বিচারের দণ্ডও নেই হাতে। অতএব সবাই সবার অর্ধসত্যগুলো তুলে না-ধরলে মিডিয়োকারদেরই সুবিধা হয়। দলবাজি, গোষ্ঠীবাজি আর প্রেসরিলিজবাজি করে গা ভাসিয়ে রাখতে পারে। আজকের মিডিয়ায় এই কচুরিপানাদেরই ভিড়। একসময় দৈনিকের সাহিত্যপাতায় আহমান হাবীবের মতো বড় সম্পাদককে পেয়েছি আমরা। এখন সেখানে বামনদের দৌরাত্ম্য। এরা লিখতে পারুক আর না-ই পারুক, নিজেদের মধ্যে লেখা-চালাচালি করে কবি-লেখক সেজে ঘুরে বেড়ায় সমাজে। অযোগ্যদের লেখা ছাপিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। *সাহিত্যে দুর্বৃত্তায়ন* নামে একটি বইয়ের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। সেই বইয়ের একটি অধ্যায় এই বামন-সম্পাদকদের নিয়েই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিদাস নেই, এসে ফিরে যান শক্তি-শামসুর

ইতালীয় লেখক উমবার্তো ইকোর একটা মজার বই আছে *মিসরিডিং* নামে। বইটি আমাকে সাদ কামালী উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিল কানাডা থেকে। বর্তমান যুগে মিডিয়া হচ্ছে এই মিসরিডিং-এরই প্রধান হাতিয়ার। এক কথায় সে ক্ষমতা ও পুঁজির লাঠিয়াল। পশ্চিমা মিডিয়া এই লাঠিয়ালের কাজটি সূক্ষ্মভাবে করার চেষ্টা করে। আমাদের মিডিয়া করে নগ্নভাবে। করার সুযোগ পায় আমাদের খ্যাতিকাঙাল কবি-লেখকদের কারণেই। শামসুর রাহমানের মতো বড় কবিও মিডিয়াকে সমীহ করে চলেন। কতটা সমীহ করেন, তার একটি ঘটনার আমি ক্ষতিগ্রস্ত সাক্ষী। অন্যকে মিথ্যাচারে অসম্মান করে-দেওয়া বাড়তি সম্মানও তিনি নিঃশব্দে গ্রহণ করেন– এই ঘটনায় আমি সেকথাই জেনেছি। *যুগান্তরে* সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের একটি আড়ি-ভাঙানো গদ্য ছাপা হলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়। একসময় আমি ঐ পত্রিকায় কাজ করেছি। সম্পাদক হওয়ার আগে সারওয়ার *ইত্তেফাকের* নিউজ এডিটর ছিলেন। আর আমি ছিলাম *মুক্তকণ্ঠের* এসিস্টেন্ট এডিটর। দুজনেই আমরা ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী একই গ্রেডের চাকর ছিলাম। কিন্তু সম্পাদক হয়ে গোলাম সারওয়ার স্পেশাল গ্রেডের মগডালে উঠলে আমার পক্ষে তার নাগাল পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই ক্রিকেটের মাঠে আমি ব্যাটে-বলে ছক্কা মারলেও আমার সম্পাদক ফুটবলের রেফারির মতো 'থ্রো ইন থ্রো ইন' বলে চেঁচান। সারওয়ার রিপোর্টিঙের মানুষ; ম্যারাডোনাদেরই তিনি ভালো বোঝেন– টেণ্ডুলকারদের একবারেই না। অতএব আমিও ক্রিকেটের বল 'থ্রো ইন' করেই ছেড়ে দিলাম *যুগান্তরের* চাকরিটি। আমি ছেড়ে দেওয়ার কারণে শামসুর রাহমান নিজে থেকেই ঐ কাগজে লেখা বন্ধ করে দিলেন। *যুগান্তরের* ঐ চাকরিটি তিনিই আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন, যখন আমি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। চাকরির তদ্বির করতে তাকে বলিনি আমি– নিজে থেকেই তিনি আমার এই উপকার করেছিলেন। এর জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞও। কিন্তু আমি যেমন চাকরিটি পেয়েছি, গোলাম সারওয়ারও তেমনি পেয়েছেন আমাকে; অতএব এই পাইয়ে-দেওয়ার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপকেরও উচিত ছিল আমার পদত্যাগপত্র মেনে নেওয়ার আগে প্রেরকের সঙ্গে একবার কথা-বলা; যা প্রাপক করেননি– এই বিষয়টিও কবিকে কিছুটা কষ্ট দিয়েছিল। তাছাড়া শামসুর রাহমান আমাকে যথেষ্ট স্নেহও করেন। সেই স্নেহের কারণেও এই ঘটনায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। এগুলোর সবই অর্ধ-অর্ধ সত্যচিত্র। কিন্তু কেউ যদি লেখেন, আমি শামসুর রাহমানকে *যুগান্তরে* লেখা দিতে বারণ করেছি, তা পূর্ণমিথ্যা। আর তাই যদি হয়, অর্থাৎ আমার কথাতেই যদি দেশের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি লেখা দেয়া না-দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তার সম্মানই বা থাকে কোথায়? কিন্তু গোলাম সারওয়ার যখন শামসুর রাহমান প্রাসঙ্গিকতায় সেই পূর্ণমিথ্যা কথাটিই পাঠকদের জানালেন, কবি নীরবেই তা মেনে নিলেন।

শামসুর রাহমান যখন *যুগান্তরে* লিখছেন না, তখন কবির শ্যামলীর বাড়ির এক বৈঠকিকে শূয়রের খোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে আল মাহমুদ প্রতীকে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতা গোলাম সারওয়ারের *যুগান্তরে* ছাপা হয়। কবিতা তো প্রতীকেরই ভুবন। অতএব চারদিকে ব্যাপারটি নিয়ে ছি-ছি পড়ে যায়। ঐ বৈঠকিতে আবুল হোসেন থেকে শুরু করে ওবায়েদ আকাশ পর্যন্ত ৫০/৬০ বছরে আবির্ভূত বাংলা কবিতার প্রবীণ-নবীন অনেক কবিই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সংগঠক ছিল শামসুর রাহমানের বড় ছেলে ফাহিয়াজের বউ টিয়া। সৈয়দ শামসুল হক, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুণসহ অনেক কবিই উপস্থিত ছিলেন সেদিন শামসুর রাহমানের নিচতলার বড় বৈঠকখানাটিতে। এসেছিলেন কাজী শাহেদ আহমেদ, সুস্মিতা ইসলাম, মেজর আখতার আহমেদ বীর প্রতীক, মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া, জামিল আখতার বীনুসহ কবি নন এমন অনেকেই। বৈঠকিটির পরিচালনার ভার ছিল আমার ওপর। নবীনে-প্রবীণে সেতুবন্ধনরচনাই ছিল ঐ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। তো, এমন একটি অনুষ্ঠানকে কভার করা তো দূরে থাক, শূয়রের খোয়ারের সঙ্গে তুলনা করায় বৈঠকিতে উপস্থিত প্রায় সবাই মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন আল মাহমুদ আর গোলাম সারওয়ারের ওপর। কেউ-কেউ এও মন্তব্য করেছিলেন– সারওয়ার ইঙ্গিতে-ইঙ্গিতেই শামসুরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন– আপনি দেশের সবচেয়ে বড় কবি হলে আমিও একটি প্রচারশীর্ষ দৈনিকের সম্পাদক। এরপর থেকে শামসুর রাহমানও আর *যুগান্তরের* নাম শুনতে পারেন না। এই গোলাম সারওয়ারই আবার শামসুর রাহমানের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ক্যাপশন করে পুলিশ-বন্দি শহীদ মিনারের একটি ছবি ছাপান তার কাগজের প্রথম পাতায়। সেটি শামসুর রাহমানের চোখ এড়িয়ে যায়, লেখা বন্ধ করার কারণে বাড়িতে *যুগান্তরের* সৌজন্য কপি আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। বন্দি ঐ শহীদ মিনার নিয়ে লেখা তার টাটকা একটি কবিতা সেদিনই *জনকণ্ঠে* বেরিয়েছে। কিন্তু ভালো ট্রিটমেন্ট দিতে পারেনি দৈনিকটি। এ-নিয়ে কবি একটু বিরক্তও। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার *আবৃত্তিলোক* আয়োজিত কবিতা উৎসব ১৯৮৫তে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনিরা কায়েস ও সমরেশ বসুর সঙ্গে এক ঘরোয়া আড্ডায়

২০০১ সালে শামসুর রাহমানের শ্যামলীর বাসায় একান্ত আড্ডায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩/১ ম্যাসন্স
ব্লক নং ১
ঢাকা ১২০৭
২৬/২/২০০৩

প্রিয় বধূমা,

তোমাকে আমার এই চিঠি অনুবাদকারীর এবং ওর কাছে লিখতে হবে, কেননা যদি তোমিনি আশ্চর্যময় তোমাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসতাম, এখনও সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমার সাম্প্রতিক ব্যবহারে আমার বাঁধ ভেঙে চুরে গিয়েছে। তবু আমি তোমার কাছে, কারও কাছে নালিশ করব না, নিজের আত্মকেই মর্মাহত করবে নিশ্চয়ই, যা কেউ জানবে না। জানার প্রয়োজনও নেই।

তবে শুধু, তোমার লেখা আমার বিরুদ্ধে ভূমিকাটি যদি আমাকে পুরোপুরি ফেরত দাও মনে করো আমার তাহলে যখন মৃত্যুর দিনে চিরশান্তি পাবো। আমার সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বুঝি আমাকে টেলিফোনে কথা বলা কিংবা দেখা করার যোগ্য মনে না করে তা হলেও কোনও আপত্তি করবো না। যেখানেই যেভাবেই থাকো ভাল থেকো। তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী

শামসুর রাহমান

পুত্রবধূ টিয়ার হাতে পাঠানো শামসুর রাহমানের চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে মন খারাপ না-করে *যুগান্তরের* প্রথম পাতা দেখতে বলি। টাটকা কবিতাটিই *জনকণ্ঠ* প্রপার ট্রিটমেন্ট দিতে পারেনি; অথচ পুরানো কবিতাই কত সুন্দর খেলিয়েছেন গোলাম সারওয়ার– অকুণ্ঠচিত্তে সেই প্রশংসাও করি। এর জন্য *যুগান্তর*-সম্পাদককে ফোনে একটা থ্যাংকস জানানোর কথাও বলি কবিকে। তাছাড়া দৈনিকটির প্রতি আমার একটি ভালবাসাও আছে। গোলাম সারওয়ারের প্রতিও। কাগজটির জন্মলগ্নে তার সঙ্গে কাজ করেছি। জেলায়-জেলায় দৌড়েছি। তার ছেলের নামও আমার নামে নাম– শাহরিয়ার। শামসুর রাহমানের কথায় যেমন আমাকে, আমার কথায় তেমনি অনেককে চাকরি দিয়েছেন তিনি তার কাগজে। নাঈমের মতো আমাকে পারিশ্রমিকে ঠকাননি। বরং না-চাইতেই বাড়তি টাকা ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন হাতে। বরিশালে দিতে চেয়েছিলেন একবার, সেকথা আগেই লিখেছি। এরপর কলকাতা বইমেলায় যাচ্ছি শুনে আরও একবার দিতে চেয়েছিলেন কাগজটির চিফ রিপোর্টার সাইফুল আলমের হাত দিয়ে। আগের বারের মতো সেবারও নিইনি। প্রতিষ্ঠানের টাকায় ভ্রমণ করলে আমি পুঁজির কাছে দায়বদ্ধ থাকব; আমার শাদাকাগজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে তাতে– সে-কারণেই নিইনি। কিন্তু গোলাম সারওয়ার দিতে তো চেয়েছিলেন? এই বাজারে কজন সম্পাদক আছেন, ব্যক্তিগত ভ্রমণেও সাংবাদিকের হাতে টাকা ধরিয়ে দিতে চান? গোলাম সারওয়ার সেই সময় প্রায়ই একটি কথা বলতেন– "যে-দৈনিকগুলো সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ড দেয়নি, সেগুলোর একটিও দাঁড়ায়নি।" এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেও এই কথা বলতে শুনেছি তাকে। আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে কজন সম্পাদক এ-কথা বলতে পারেন?– গোলাম সারওয়ার সম্পর্কে আমার কাছে এই অর্ধসত্যগুলোও জমা আছে। (আবুবকর সিদ্দিকের লেখা থেকে আমার সম্পর্কিত অংশ কেটে ছাপালেই তার সম্পর্কিত এই অর্ধসত্যগুলো মিথ্যে হয়ে যায় না। আমার সম্পর্কে ইঙ্গিতে বানোয়াট কথা লিখলেও– না। ভালোকে ভালো বললেই মন্দকে মন্দ বলার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়– রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষাটি নিয়েছি।)

শামসুর রাহমান বটবৃক্ষ। গুঁড়ির চেয়ে তার ঝুরির বহর বেশি। পশ্চিমবঙ্গের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। যে-বয়সে সমরেশ বসু পরার্থপর কলমে রামকিঙ্করের জীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন, সেই বয়স পাড়ি দিয়ে এসেও শামসুর-সুনীল আত্মপরতায় ব্যস্ত থাকেন চব্বিশ ঘণ্টা– মিডিয়ার ক্যামেরা দেখলেই হাঁ-বদনে হাসেন। শামসুর রাহমান আবার কিছুটা সংশয়বাদী প্রকৃতিরও। তার এই সংশয়ের কারণে নিকটজনদের তিনি বিপদেও ফেলেন মাঝেমধ্যে। সেই বিপদে মাত্র কিছুদিন আগেই শাহরিয়ার কবিরকে পড়তে হয়েছে। সেই ঘটনারও সাক্ষী আমি। সংশয় আর সন্দেহের কারণে বিউটি বুক হাউসের হামিদুল ইসলামকেও হারাতে হয়েছে *শামসুর রাহমান রচনাবলির* পাণ্ডুলিপি। সেই বিয়োগান্তক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটিরও ব্যর্থ মধ্যস্থতাকারী আমি। তাই *যুগান্তর* বিষয়ে কবির সংশয় কাটাতে আবারও সেই ফোনের অনুরোধ করি। আমাদের দুজনের কথাও হচ্ছিল ফোনে। আমার কাছ থেকে নম্বর নিয়েই শামসুর রাহমান ফোন করলেন গোলাম সারওয়ারকে। তারপর ফোনে-ফোনেই আমাকে জানালেন সেকথা। গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে শামসুর রাহমানের 'আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি'রও অবসান হল সেই সঙ্গে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই গোলাম সারওয়ার প্রকৃত ঘটনার ঠিক বিপরীত কিছু কথা লিখে ঐ আড়ি-বাড়ি বিষয়ক গদ্যটি লিখলেন শামসুর রাহমানকে নিয়ে। *যুগান্তরেই*। 'চিরদিনের শামসুর রাহমান' শিরোনামের সেই গদ্যটি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ *যুগান্তর সাময়িকী*তে ছাপা হয়। আমার কারণেই এতদিন শামসুর রাহমান *যুগান্তরে* লেখেননি এবং 'মনোবেদনার অধ্যায়টি' মুছে ফেলে আবার তিনি '*যুগান্তরে*র সাহিত্য পাতার সিংহাসনে রাজাধিরাজ হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন'— এমনই ছিল সেই লেখার মূল প্রতিপাদ্য। সারওয়ারের গদ্যের যে-'একদা সহকর্মী'টি শামসুর রাহমান আর *যুগান্তরে*র মধ্যে 'অদৃশ্য একটি দেয়াল সুচারুরূপে তৈরি করেছিলেন', আমিই যে সেই 'একদা', তা যে-কোনও বোকা পাঠকও বুঝে নিতে পারবে। নাম গোপন রেখে এ-জাতীয় কুৎসারটনাকে আজকের ভাষাবিজ্ঞানে অপরাধ মনে করা হয়। কারণ, তাতে একজনের কারণে অনেককে সন্দেহভাজন করে তোলা হয় পাঠকদের কাছে। আধুনিক যুগের এই কাপুরুষ-ভাষারীতিটি আজকের উত্তরআধুনিক যুগে সম্পূর্ণই অচল। তো, এই ছিল 'চিরদিনের শামসুর রাহমানে'র মূল বক্তব্য। শামসুর রাহমানও জানেন, তা পূর্ণমিথ্যা। আসল অর্ধসত্য ঠিক এর বিপরীত। '*যুগান্তরে*র সাহিত্য পাতার সিংহাসনে রাজাধিরাজ হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়ে' শামসুর রাহমান ভুলেই গেলেন, ঐ পত্রিকায় তাকে 'শূয়র' বলে গালি-দেওয়া কবিতাও ছাপা হয়েছিল, যার জন্য গোলাম সারওয়ারের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল সেই লেখায়। এবং একবারও মনে হল না তার, এই সম্মান তিনি পেয়েছেন আবু হাসান শাহরিয়ারকে মিথ্যাচারে অসম্মান করার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনায় এবং আরও কিছু মতপার্থক্যের কারণে আমি তখন শামসুর রাহমানের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। এতে তিনি দুঃখ পেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। টিয়াকে দিয়ে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন বইমেলার মাঠে। তখন তিনি কিছুটা অসুস্থও। আমি তার দুঃখ ভোলাতে ছুটে গিয়েছিলাম তার শ্যামলীর বাসায়। শাদা চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে এসেছিলাম পিতৃতুল্য কবিকে।— তার সঙ্গে আমার এরকমই সম্পর্ক।

আমি শামসুর রাহমানের দুঃখ ভোলানোর চেষ্টা করলেও তিনি আমার মন বোঝার চেষ্টা করেননি সেদিন। সারওয়ারের লেখার প্রতিবাদ করে দুই লাইন হলেও তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা উচিত ছিল। শামসুর রাহমান না-বুঝলেও ছোটকাগজের তরুণ লেখকরা আমাকে ঠিকই বুঝেছিল সেদিন। বইমেলা ২০০৩-এর লিটল ম্যাগাজিন কর্নারে তখন *মঙ্গলসন্ধ্যার* চটি সিরিজের বইগুলো নিয়ে বেশ হইচই। *মঙ্গলসন্ধ্যার* সম্পাদক-প্রকাশক সরকার আমিন, কবির হুমায়ূন আর *শালুক*-সম্পাদক ওবায়েদ আকাশ মাতিয়ে রেখেছে সেই কর্নার। আজ বগুড়া থেকে *বিপ্রতীক*-সম্পাদক ফারুক সিদ্দিকী তো কাল বরিশাল থেকে *জীবনানন্দ*-সম্পাদক হেনরী স্বপন তো পরশু মুক্তাগাছা থেকে *মেইনরোড*-সম্পাদক কাজী নাসির মামুন এসে হাজির। রহমান হেনরী, মুজিব মেহদী, গাজী লতিফ, অনু হোসেন, বায়তুল্লাহ কাদেরী, সৈকত হাবিব, শাহনাজ মুন্নী, শাহেদ কায়েস, কাজল কানন, লোপা মমতাজ, ফেরদৌস মাহমুদ, জাহানারা পারভীন, নিতুপূর্ণা, আমজাদ সুজন, লোকমান ইলিয়াসসহ অনেক-অনেক তরুণ কবি-লেখকের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নিজেকে নবায়ন করে নেওয়ার এই সুযোগ আমিও হাতছাড়া করিনি। যেদিনই বইমেলায় গেছি, একবার হলেও ঢু মেরেছি লিটল ম্যাগাজিন কর্নারে। *অমিত্রাক্ষর*, আর *লোক* পত্রিকা দুটি খুব ভালো চলেছে সেই মেলায়। ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত শাজান শীলন সম্পাদিত *কহনও* সবার নজর কেড়েছে। এরকমই এক ছোটকাগজীয় আড্ডায় কবির হুমায়ূনসহ কয়েকজন তরুণ একদিন কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিল– "রাহমান ভাইয়ের উচিত ছিল, গোলাম সারওয়ারের লেখাটির প্রতিবাদ করে পরের সপ্তাহেই একটা গদ্য লেখা।"

এক অগ্রজের নীরবতায় এই যে অনেক অনুজের প্রতিবাদ, সেটাই আমার নতুন অর্ধসত্য। ভালবাসাখচিত সেই অর্ধসত্যের দাগ আমার একটি কবিতাতেও লেগে আছে। তার কিছু অংশ এরকম–

> শেখ সাদী অস্ত গেলে ঘরে ফেরে ওমর খৈয়াম। গালিভার নেই, দ্যাখো, বামনেরা কচুপাতা সম্পাদনা করে। বইমেলা এলে দেখি মাঠে নামে বামনতররা। তুমি যদি নত হও, তাহলেই কভারেজ পাবে। হাতের বিঘতে আমি বহু-বহু বামন মেপেছি। কারুরই উচ্চতা নেই, তারা শুধু প্রস্থে বেড়ে থাকে। এক চাটিতেই পায়ে শুয়ে পড়ে, মূলত শুয়েই থাকে তারা। মুতে দিলে চেটে খায়, যাহা আমি প্রায়শ চাটাই। কিসের মিডিয়া, যদি খাঁটি হও, শাদাকাগজেই তুমি কবি। লোকমুখে যে প্রবাদ, তার কোনও লাগে না পদবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-কোঠাবাড়ির বিলে সিন্দাবাদ কখনও আসেনি

আসাদ মান্নান সম্পর্কিত আজিজ মার্কেটের ঐ ঘটনাটিও অর্ধসত্য। আসাদ সাম্প্রদায়িক লোক নয়। 'মালাউন' কথাটি তার সামাজিক কানের অর্জন। সারাক্ষণই আমরা এ-জাতীয় কথা শুনতে পাই আমাদের চারপাশে। তারই প্রভাবে ঐ কথা তার মনের মধ্যেও ঘাপটি মেরে ছিল। কিন্তু একজন কবি হিসেবে নিজেরই ওর করণীয় ছিল, সমাজকে প্রভাবিত করা। আসাদ তা একসময় পারত; এখন পারে না। কারণ, জাগতিক পৃথিবী তার বেশিরভাগ সময় খেয়ে ফেলেছে। চাকরির দাসত্বই তার নিয়তি এখন। সেই চাকরি আবার সরকারি চাকরি। যখন যে-সরকার ক্ষমতায় আসে, সেই সরকারের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কবিতার যে চারা-গাছটি সে রোপণ করেছিল একদিন বুকে, সে-চারা বটেরই চারা ছিল। কিন্তু মাঠের অভাবে তা মহীরুহ হয়ে উঠতে পারেনি। তবু একান্ত পরিচর্যায় আসাদ তাকে বনসাই হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে। হঠাৎ-হঠাৎ বটের স্বরেই কথা বলে সেই বনসাই। আসাদের এই অর্ধসত্যের কথাও আমি জানি।

কবিতাভাসানের আগেও আমি একাধিকবার টিএনও আব্দুল মান্নানের নবাবগঞ্জে গিয়েছি। এই আব্দুল মান্নানই আসাদ মান্নান নামে কবিতা লেখে। ২০০০ সালে শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আসাদ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করেছিল তার উপজেলায়। শামসুর রাহমানকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিল সে-সপ্তাহ। সংবর্ধনাও জানিয়েছিল উদ্বোধক কবিকে। কবির পরিবার ছাড়াও সিকদার আমিনুল হক, রুবি রহমান, মুহম্মদ নূরুল হুদা, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, কবির হুমায়ূন, শামীম রেজা ও ওবায়েদ আকাশও গিয়েছিল সেবার নবাবগঞ্জে। সেই বজরায় চেপেই। শিক্ষা-সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। তাদের মধ্যে কারা মুসলমান, হাত তুলে দ্যাখাতে বলেছিল আসাদ– কিছু হাত উঠল, কিছু উঠল না। কারা হিন্দু, কারা খ্রিস্টান, কারা বৌদ্ধ প্রশ্নেও সব হাত একসঙ্গে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল বাঙালির হাত আহ্বান করতেই। আসাদের এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি আমার ভালো লেগেছিল। এ-থেকে আসাদের অসাম্প্রদায়িক মনেরও পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবাবগঞ্জের পথে বজরায় রুবি রহমান ও শামসুর রাহমানের সঙ্গে আলাপরত।
ডানে সিকদার আমিনুল হক ও জোহরা রাহমান এবং পেছনে আসাদ মান্নান,
মুহম্মদ নূরুল হুদা ও শহীদুজ্জামান ফিরোজ

নদীদৃশ্যে শামসুর রাহমানের সঙ্গে। বজরার ছাদে শামীম রেজা ও ওবায়েদ আকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

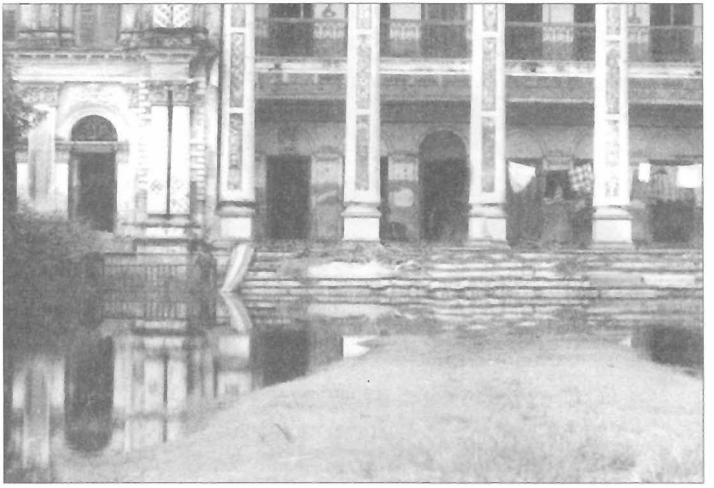

কোপাকোলার বণিকবাড়ি

মন্দিরা হাতে কোঠাবাড়ির চকে আসাদ মান্নানের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায়। 'বাঙালি'র জায়গায় 'মানুষ' বসিয়ে পৃথিবীর দেশে-দেশে এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি চালু করা গেলে কোনও জাতিসংঘের প্রয়োজন হত না।

অনুষ্ঠান শেষে সবাই চলে গেলেও আমি আর শহীদুজ্জামান ফিরোজ থেকে যাই নবাবগঞ্জে। কোঠাবাড়ির চক দ্যাখাতে আসাদ আমাদের রেখে দিয়েছিল। চক মানে বিল। পরদিন বিকেলে টিএনওর জিপে বান্দুরার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখানে একটা বাদ্যযন্ত্রের দোকান থেকে মন্দিরা কিনলাম। ঘাটের রেস্তারাঁয় চা খেতে-খেতেই শ্যালো নৌকা রেডি। টিএনও আসায় ঘাটে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। আগেরদিন থেকেই এই দৃশ্য লক্ষ করে আসছি আমি আর ফিরোজ– যেখানেই থামে আসাদের গাড়ি, লোকজন ভিড় করে দাঁড়ায়। ছোট-শহরের এই লাভ। বড়-শহরের ডিসি-এসপিরাও এই সম্মান পান না। এ-নিয়ে 'নবাব আসাদুদ্দৌলা' বলে ক্ষেপিয়েছিও আসাদকে।

ইছামতীর বুক চিরে কোঠাবাড়ির চকে পৌঁছতে আমাদের ঘন্টাখানেক সময় লাগল। একটু ঘুরপথে ইংরেজ আমলের একটা গির্জাও দেখে গেলাম। কে জানে, আর কোনওদিন আসা হবে কিনা এখানে। আসাদ জানাল– কোঠাবাড়ির চকে মহাত্মা গান্ধীও নাকি এসেছিলেন একবার। নবাবগঞ্জের কোলাকোপায় অনেক বড়-বড় হিন্দু-বণিক ছিল সেইসময়। কলকাতার সঙ্গে নৌপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাদের। ইছামতী পাড়ের ছোট্ট এই উপজেলার বনেদী অট্টালিকাগুলো সেই স্মৃতিই বহন করছে। নবাব-জমিদার বাড়ির চেয়ে কোন অংশেই সেগুলো কম নয়। কিন্তু সব অট্টালিকা আর সব সভ্যতাই মন থেকে মুছে গেল কোঠাবাড়ির চকে পৌঁছে। হাতের মন্দিরাও বাজাতে ভুলে গেলাম। মাঝচকে নৌকা থামাতে বলল আসাদ মাঝিদের। শ্যালোর ভটভটি থামল। আমরা তিন বন্ধু– আসাদ, ফিরোজ আর আমি– যে যার মতো নির্বাক। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে আমাদের লেখালেখি জীবনের শুরু। তখন আরও যারা কবিতা লিখত, পথের দম পথেই ফুরিয়ে গেছে অনেকের। যাদের ফুরোয়নি, তাদেরও সবার সঙ্গে সবার দ্যাখা হয় না। শিবিরে-শিবিরে বিভাজনও কম হয়নি। কিন্তু আমরা তিন বন্ধু অনেক বছর পরও সেই আগের মতো একসঙ্গে হতে পেরেছি। – আবার যে যার কাজবাজে হারিয়ে যাব। আসাদ তার টিএনওর ঘরে বসে ছড়ি হাঁকাবে, আমি আমার সাংবাদিকতার জীবনে এবং ফিরোজ তার শীতলক্ষ্যা পাড়ের অভাবী পরিবারে। সেই আমরাই জলের কোঠাবাড়িতে প্রাণের শ্যাওলা। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, এই শ্যাওলা থেকেই মানুষের জন্ম। কোঠাবাড়ির চকে নৌকা থামিয়ে আমরা তিনবন্ধুই তখন সেই শ্যাওলা-মানব। 'কিছু নেই উত্তেজিত হলে/ কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে'– জীবনানন্দ দাশের এই দুই পঙ্‌ক্তি ছাড়া আর কোনও কবিতাই তখন মনে করতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় ফিরে কিছুদিন পর এই কোঠাবাড়িকে একটি কবিতার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম–

> এ-কোঠাবাড়ির বিলে সিন্দাবাদ কখনও আসেনি। শোনা যায়, নেংটি পরে গান্ধী এসেছিল। উপজেলা অস্ত গেছে বান্দুরার ঘাটে। গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি ফিরে গেছে কোম্পানি আমলে। গলুই মেলেছে ডানা, এই নাও আন্দামানে যাবে। মন্দিরার হাতকড়া আমাদের সুরবন্দি করে। আকাশ ঠেকেছে পিঠে, মেঘে-মেঘে প্রশ্নবোধকতা। অপার জলের ঘড়ি ছুটে চলে ঢেউয়ের কাঁটায়। পাটাতনে মহাকাল, পূর্ণিমার চাঁদ রাজটিকা। চিদানলে দাহ করি কবিতার কুশপুত্তলিকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরি বড় বিদ্যা, ধরা না-পড়িলে লোকে বলে সাধু

চোরের দশদিন, গেরস্তের একদিন। তসলিমার ক পড়া শেষ হলে আমাকে লেখা ওর চিঠিগুলো খুঁজে বের করলাম। ৮/৯ টা পেলাম। লিখেছিল আরও বেশি। আমার সংগ্রহে অনেকের চিঠিই আছে। তার কিছু প্রেমপত্র। ইংরেজিতে মাস্টার্স এক গোলাপসুন্দরীর দুটি চিঠিও পেয়ে গেলাম সেখানে। তার কোনও চিঠি আমার কাছে থাকার কথা নয়; কারণ বিয়ের পর মেয়েটি স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে আমার কাছে এসেছিল একদিন; এসে সব চিঠিই ফেরত নিয়ে গিয়েছিল। সেও প্রায় একযুগ আগের কথা। দুটি চিঠি তারপরও প্রাপকের কাছে কীভাবে-কীভাবে থেকে গেছে। এই মেয়েটি প্রথম যেদিন আমার কাছে আসে, হাতে রক্তগোলাপ ছিল। উপহার গ্রহণ করে নিজের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি শুনিয়েছিলাম– 'গোলাপ দিয়ে আরম্ভ যার, ধুতুরা তার শেষ।'– হয়েছেও তাই। গোলাপসুন্দরীকে আমি প্রতিবছর বইমেলায় ধুতুরা-রঙ শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখি। সঙ্গে তার স্বামী থাকে। কখনও-কখনও লিরিকের মতো মিষ্টি মেয়েটিও। আমাকে দেখলে গোলাপসুন্দরী না-চেনার ভান করে। আমার ধারণা, মেলার মাঠে আবার দ্যাখা হলে তসলিমা তা করবে না। কারণ তার সাহস আছে। আমি সে-সাহসের প্রশংসা করি।

তসলিমার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনগ্রন্থ ক পড়ে বোঝা মুশকিল, কতটা গোলাপ আর কতটা ধুতুরা আছে সেখানে। যখনই ভাগে কম পড়েছে, তখনই ধুতুরার বিষ ঢেলেছে লেখায়। কোথাও সুবিধা করতে না-পারলেই তসলিমার আসল চেহারা বেরিয়ে আসে, সেটা আমি মেডিকেলে পড়তেই লক্ষ করেছি। বাইরে-বাইরে শীতল, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সাপের মতো হিস-হিস করে। পরতা না-পড়লেই ক্ষেপে-টেপে লাল। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাড়াও কবিতা লেখার চেষ্টা করত একটু-আধটু– রুদ্রর কবিতার নকল হয়ে যেত। একথা বললেই ক্ষেপে যেত তসলিমা। ক্ষেপে গিয়ে কথা বলাই ছেড়ে দিত কয়েকদিনের জন্য। খুব বেশি অবশ্য কথা হয়নি সেই সময় তসলিমার সঙ্গে। আমরা ঢাকা কলেজ আর নটরডেম কলেজ থেকে পাশ করা ছেলেরা একসঙ্গে চলাফেরা করতাম। তসলিমা থাকত

আনন্দমোহন আর মোমিনুন্নেসা থেকে আগতদের সঙ্গে। আলমগীর, আরজু, পার্থ, মার্শাল- এই চারজন ছিল আমার মেডিকেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরজু ডাক্তার হয়েছে। পার্থর খবর জানি না। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে আলমগীর আর আমি মেডিকেল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মেডিকেল ছেড়ে আলমগীর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে যায়। আমি ঢুকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। মেডিকেলে একবছর পড়াশোনার পর ছেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের মধ্যে বিচ্ছেদ– এই আমার উচ্চশিক্ষার দৌড়। কিন্তু পা টিপে-টিপে তসলিমা ঠিকই এমবিবিএস পাশ করেছে। লাশকাটা ঘরেও সে পা টিপে-টিপেই ডিসেকশন টেবিলে এসে দাঁড়াত। এক-একটা লাশের টেবিল ঘিরে পনেরো বিশজন ছাত্র-ছাত্রী। গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই শরীরবিদ্যার পাঠ নিতে হত। তবে মেয়েদের দেখলে আমরা-ছেলেরা জায়গা ছেড়ে দিতাম। মেয়েরা একপাশে, ছেলেরা আরেক– এভাবেই এনাটমির প্র্যাকটিক্যাল করতাম বেশিরভাগ সময়। কিন্তু তসলিমা ছেলেদের দিকে দাঁড়াতেই বেশি পছন্দ করত। ক্লাশে সবার পরে ঢুকত। ঢুকেই ছেলেদের ভিড়ে সেঁদিয়ে যেত। ফলে আমাদের টেবিলের সব ছেলেকেই ওর শরীরের ধাক্কা সহ্য করতে হয়েছে। বয়স সবারই কম ছিল। এ-নিয়ে ছেলেরা হাসি-ঠাট্টাও করতাম। আরজু বা পার্থ বা মার্শাল বা আলমগীর কেউ একজন তসলিমাকে নিয়ে একটা ছড়া বানিয়ে ডেডবডি থেকে খুঁচিয়ে-তোলা এক খণ্ড ফাসা লাটা (চামড়ার নিচের পুরু মেদ)সমেত ছড়া-লেখা একটা চিরকুট ওর অ্যাপ্রোনের পকেটে আলগোছে চালানও করে দিয়েছিল একদিন–

আমলাপাড়ার তসলিমা,
এসেই পাছা ঘষলি মা?

বোধহয় তসলিমার মনে হয়েছিল– ছড়াটা আমারই লেখা। এ-জাতীয় ছড়া তো কতজনই মুখে-মুখে বানায়। এ সম্পর্কে পরে কখনও কিছু জিগ্যেসও করেনি সে। কিন্তু *উতল হাওয়া* না কোন একটা বইয়ে এর জন্য আমাকেই পুরস্কৃত করেছে। যদিও ছড়াটা সে উদ্ধার করেনি তার লেখায়। আরজু বা পার্থ বা মার্শাল বা আলমগীরের বানানো ঐ ছড়ার জন্য তসলিমা আমাকে আদর করে 'ছড়াকার' সম্বোধন করে। অন্যের প্রাপ্য প্রশংসা আমি পাই। সেই সঙ্গে ফিরে যাই মেডিকেলের সেই দিনগুলোয়। পেছনের সব কিছুই মধুর। সাপের হিস-হিসও।

ক-এ তসলিমা আমার সঙ্গে তার মেলামেশার অনেক ঘটনাই উল্লেখ করেছে। সাল-তারিখ তো খুব একটা দেয়নি, তাই কালানুক্রমও নেই ঘটনাগুলির। তাছাড়া আমাকে এমন ভিলেন হিসেবে দেখিয়েছে যে, সিনেমার পরিচালকরা আমার পিছু নিতে পারে। ফিল্মে তো এখন ভিলেনদেরই জয়-জয়কার। সে যাই হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

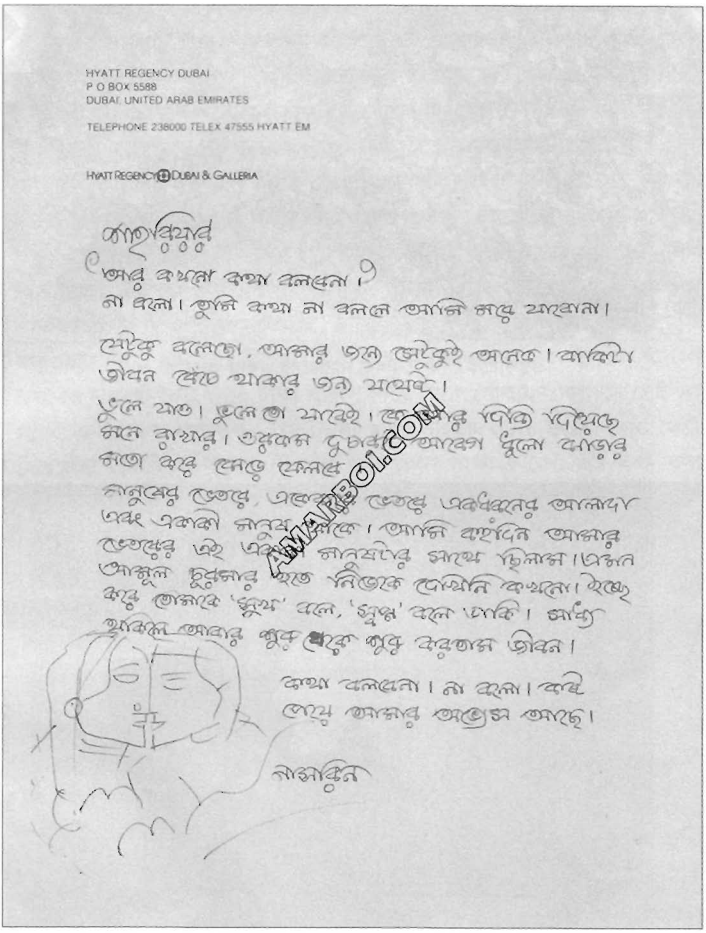

HYATT REGENCY DUBAI
P O BOX 5588
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

TELEPHONE 238000 TELEX 47555 HYATT EM

HYATT REGENCY DUBAI & GALLERIA

শাহরিয়ার
০৩৫

আর কখনো কথা বলবেনা?
না বলো। তুমি কথা না বললে আমি মরে যাবোনা।

যেটুকু বলেছো, আমার জন্য সেটুকুই অনেক। বাকিটা জীবন বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।
ভুলে যাও। ভুলে তো যাবেই। তোমার দীক্ষা দিয়েছে মনে রাখার। এরকম দুঃখের আবেগ ধুলো ঝাড়ার মতো ঝেড়ে ফেলো।
মানুষের ভেতরে, একেকজনের ভেতরে একেকজনের আলাদা এবং একাকী মানুষ আছে। আমি বহুদিন আমার ভেতরের এই একাকী মানুষটার সাথে ছিলাম। এখন আমূল চুরমার হতে নিভৃতে দেখিনি কখনো। ইচ্ছে করে তোমাকে 'সুখ' বলে, 'স্বপ্ন' বলে ডাকি। আমি আবার সুখ থেকে সুখ করতাম জীবন।

কথা বলবেনা। না বলো। কবে থেকে আমার অভ্যেস আছে।

নাসরিন

AMARBOI.COM

গ্রন্থকারকে লেখা তসলিমা নাসরিনের চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থকারকে লেখা তসলিমা নাসরিনের একান্ত অনুভূতি

*গতি*র অফিসে তসলিমা নাসরিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

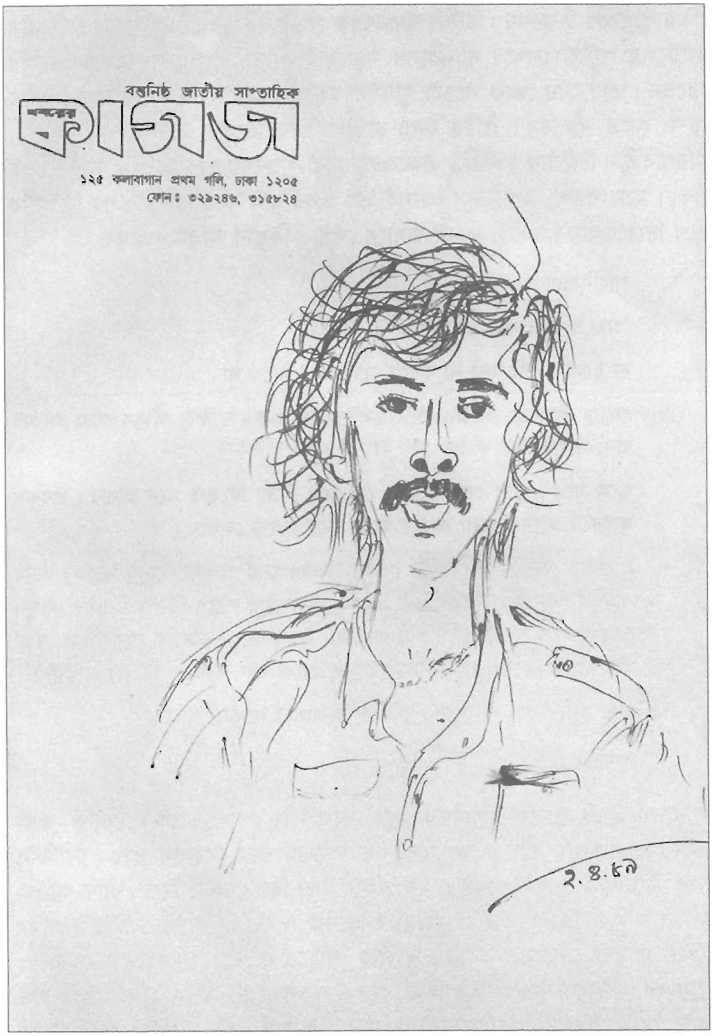

তসলিমা নাসরিনের আঁকা গ্রন্থকারের স্কেচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসরিনের একটা চিঠিতে চোখ আটকে গেল। ১৯৮৮ সালে লেখা। ক-এর মতো চিঠিতেও তারিখ নেই। খামে অঙ্কিত পোস্ট অফিসের সিল থেকে সালটা উদ্ধার করলাম। ১৯ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের ঠিকানায় লেখা। আমার অধুনালুপ্ত বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান *গতি*র ঠিকানায়। চিঠিটা বারকয়েক পড়লাম। দুবাইয়ের হায়াত রিজেনসি হোটেলের প্যাডে লেখা। নাসরিনের বড় ভাবী গীতা বাংলাদেশ বিমানে চাকরি করতেন। তার কাছ থেকে পাওয়া পৃথিবীর বড়-বড় হোটেলের প্যাডে চিঠি লিখতে পছন্দ করত নাসরিন। চিঠির নিচে প্রতীকি ছবি এঁকেও দৃষ্টি-আকর্ষণ করত। তারিখবিহীন চিঠিটায় চুম্বনরত একজোড়া নারী-পুরুষের ছবি আছে। নাসরিনেরই আঁকা। মনে পড়ল, এর দুদিন আগেই ওর ওপর রাগ করে মুখের ওপর রিসিভার রেখে দিয়েছিলাম। চিঠিটা তারই জবাবে লেখা। কিছুটা অভিমানজাতও–

শাহরিয়ার,

'আর কখনো কথা বলবেনা।'

না বলো। তুমি কথা না বললে আমি মরে যাবো না।

যেটুকু বলেছো, আমার জন্যে সেটুকুই অনেক। বাকিটা জীবন বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।

ভুলে যাও। ভুলে তো যাবেই। কে আর দিব্যি দিয়েছে মনে রাখার। ওরকম দুচারটে আবেগ ধূলো ঝাড়ার মতো করে ঝেড়ে ফেলবে।

মানুষের ভেতরে, একেবারে ভেতরে একধরনের আলাদা মানুষ থাকে। আমি বহুদিন আমার ভেতরের এই একাকী মানুষটার সংগে ছিলাম। এমন আমূল চুরমার হতে নিজেকে দেখিনি কখনো। ইচ্ছে করে তোমাকে 'সুখ' বলে 'স্বপ্ন' বলে ডাকি। সাধ্য থাকলে আবার শুরু থেকে শুরু করতাম জীবন।

কথা বলবে না। না বলো। কষ্ট পেয়ে আমার অভ্যেস আছে।

নাসরিন

নাসরিনের ইচ্ছে হয়েছিল আমাকে 'সুখ' বলে 'স্বপ্ন' বলে ডাকে। 'যেটুকু' কথা একদিন বলেছিলাম তার সঙ্গে, 'সেটুকুই' অনেক মনে হয়েছিল তার– 'বাকিটা জীবন বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট'ও। অর্ধেকটা সত্য ছিল সেই চিঠিতে। বাকি অর্ধেক নাসরিন পুষিয়ে দিয়েছে ক-এ। মিথ্যার অনেক খাদও মিশিয়েছে তাতে। পথে-ঘাটেও বাজার পেয়েছে বইটি। বাজার পাইয়ে দিয়েছে আমাদের মিডিয়া। *যুগান্তরে*র হাসানুজ্জামান সাকী দিয়ে শুরু। পরদিন *জনকণ্ঠে*র হাসান হাফিজও একটা ভালো রিপোর্ট করেছিলেন। তারপর শুরু হল হলুদ-সাংবাদিকতা। সর্ষের রঙও হলুদ। পাঠককে সেই সর্ষেই দেখিয়েছে আমাদের মিডিয়া। অর্ধসত্য আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যার খাদগুলোকে সমান ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। কোনও-কোনও কাগজ শুধু খাদগুলোর ওপরই জোর দিয়েছে। বাকি যে-অর্ধসত্যগুলো থেকে গেল আরও-আরও মানুষের কাছে, তার খবর কে রাখে? তবে নাসরিনের বুকের পাটা আছে। খাদ মিশিয়ে হলেও সে অনেক অর্ধসত্য বলতে পারে, যা আমাদের অনেক বড় লেখকই পারেন না।

নিজের ক্যামেরায় তোলা আমার কিছু ছবিও নাসরিন প্রিন্ট করে পাঠিয়েছিল একসময়। ছবিগুলো সে তুলেছিল ওর *সকাল আবৃত্তি পরিষদে*র অনুষ্ঠানের আগে-পরে। আমাকে বিশেষ অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। একটা ছবির পেছনে অসংখ্যবার 'সুখ', 'শাহরিয়ার', 'ভালবাসা', 'লাভলু', 'নাসরিন' 'রাগ কোরো না' ইত্যাদিও লিখে পাঠিয়েছিল। লাভলু আমার ডাকনাম। ময়মনসিংহ থেকে কুমিল্লায় বসবাস-বদল করার পর লাভলু নামটা মুছে গেলেও ঐ নামে আমাকে অনেক ডেকেছে নাসরিন। আমার *গতি*র অফিসে বসে আড্ডাও পিটিয়েছে অনেক। যেভাবে নাঈম ময়মনসিংহে ছুটে-ছুটে যেত নাসরিনের টানে, সেভাবে নাসরিনও ঢাকায় আমার কাছে আসত একসময়। এ-নিয়ে বাহাদুরি করার কিছু নেই। মানুষের কাছে মানুষই তো আসবে। বন্ধুর কাছে বন্ধু। কিন্তু *গতি*র সেই মধুর আড্ডাগুলোর কথা নাসরিনের মনে নেই। তবে কি যেখানে 'শরীরের প্রয়োজনে শরীর বিনিময়' নেই, সেখানে নাসরিনের স্মৃতিও নেই কোনও? বিনিময়ের এই মন্ত্রটা ক-এ অকপটেই পাঠককে জানিয়েছে বইটির লেখক। তবে কি শরীর-বিনিময়ের আশাতেই আমার ছয়তলার ফাঁকাবাড়িতে গিয়েছিল? আমি তার প্রয়োজন মেটাতে পারিনি বলেই কি আজ এতদিন পর অভিমানে ফেটে পড়েছে? তাহলে ঘটনাটিকে সে উল্টো করে বলল কেন? পেস্টিঙের ভুলে মাঝেমধ্যে অনেক কিছু উল্টো ছাপা হয়। এক্ষেত্রে ভুলটা পেস্টিং-টেবিলে হয়নি– হয়েছে নাসরিনের লেখার কম্পিউটারে। পেস্টার– নাসরিন নিজেই। গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে পেছনের এ্যাম্বুলেন্সে লেখা AMBULANCE শব্দটি পড়ার মতো করে পড়লে অবশ্য ওর বক্তব্য ঠিক আছে।

*গতি*র সেই ব্যবসা কবেই লাটে উঠেছে। নাসরিনও আর দেশে নেই। কিন্তু আমার কাছেও অনেক অর্ধসত্য জমা আছে। সেই কবে, ১৯৮২ সালে, আমার প্রথম বই হাতে পেয়ে আমাকে 'অবকাশ' থেকে চিঠি লিখেছিল নাসরিন। সে-চিঠি এখনও আছে। তারও আগে মেডিকেলের বন্ধুদের কাছে আমার বই পুশসেল করে মানি অর্ডারে টাকা পাঠিয়েছে। ভালবাসার পঙ্‌ক্তি লিখে অনেক বই উপহার দিয়েছে। আছে। আমার অনেক ছবি তুলেছে ওর ক্যামেরায়। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ* হাতে নিজেও ছবি তুলেছে। এগুলো যদি হারিয়েও যায় কখনও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতির নাসরিন তো আর হারিয়ে যাচ্ছে না। আবর্জনা মনে করে মন থেকে যদি সব অনুভূতিই ঝেঁটিয়ে বিদায় করি, তাহলে আর থাকল কী জীবনে?

'সুখ' আর 'স্বপ্ন'খচিত চিঠিটি লেখার পরের বছর *খবরের কাগজ* অফিসে নাঈমের টেবিলে বসে নাসরিন আমার একটা স্কেচ এঁকেছিল। *খবরের কাগজে*র প্যাডে। আমি আমার মতো কথা বলছিলাম সবার সঙ্গে, নাসরিন নিজের মতো স্কেচটা আঁকছিল। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে এঁকে-ফেলা স্কেচটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেখে প্রশংসা করেছিল সবাই। আজ আমিও না-করে পারছি না। খুব ভালো এঁকেছিল সেই সময়ের আমিকে।

এই সময়ের আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। নাঈম তখন নাসরিনকে বিয়ে করার জন্য পাগল। প্রস্তাবটা আমিই প্রথম দিই। বইমেলার মাঠে। একটু নাটকীয় ভাবেই। নাসরিনের সঙ্গে রুদ্রর তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেলার মাঠে নাসরিনের সঙ্গে দ্যাখা হতেই ওকে আমি ভিড়ের মধ্যে একটু আলাদা করে নিয়ে বলেছিলাম, "তোমাকে একটা ভালো ছেলের সন্ধান দিতে পারি, যে তোমাকে খুউব ভালবাসে। যদি বিয়েতে তোমার আপত্তি না-থাকে, তাহলে তার নাম বলতে পারি।"

নাসরিন আগ্রহভরা গলায় শুনতে চেয়েছিল নামটা। আমি একটু রসিকতা করার ইচ্ছে নিয়ে বলেছিলাম, "শাহরিয়ার।"

এক মুহূর্ত দেরি না-করে শক্ত-হাতে আমার হাত চেপে ধরেছিল নাসরিন। বলেছিল, "আমি রাজি; এখনি নিয়ে চলো আমাকে।"

মন নিয়ে রসিকতা করা অনুচিত হয়েছে বুঝতে পেরে আমি ক্ষমা চেয়েই বলেছিলাম, "স্যরি, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছিলাম। আমার জায়গায় নাঈমের নামটা বসিয়ে উত্তরটা নতুন করে দাও।"

আমার কথায় ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল সেদিন নাসরিন। গলার স্বর সপ্তমে তুলে বলেছিল, "আমার ভালবাসা নিয়ে ঠাট্টা করো তুমি?"– বলেই হনহন করে হাঁটা ধরেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের বখাটে ছেলে আজও হাঁটে পুরানো রাস্তায়

অনেকদিন পর তসলিমার নতুন লেখা বই আর নাসরিনের পুরানো আঁকা স্কেচ পাশাপাশি রেখে মেলাবার চেষ্টা করলাম। মিলল না। বইয়ের তসলিমা অভিয়োগ করেছে, তাকে আমি জোর করে চুমু খেতে চেয়েছি, হাত ধরতে চেয়েছি ইত্যাদি। কিন্তু নাসরিনের চিঠি জানে, স্কেচ জানে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে বসে থাকা ওর ছবি জানে– সেই ইচ্ছে আমার নয়, ওর নিজেরই ছিল। মনে পড়ে, যেদিন আমার 'মোহরপ্রার্থী' কবিতাটি ছাপা হল কাগজে, ময়মনসিংহ থেকে ফোনে ওর ভালো লাগার কথা জানিয়েছিল। বলেছিল, এই কবিতাটি ও স্থানীয় একটি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবে দু-একদিনের মধ্যেই। স্বরবৃত্তে এত ভালো কবিতা নাকি এর আগে ও পড়েনি কখনও। ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থেকে রেহাই পেতে ওকে আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতা পড়তে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সে-ব্যাপারে ওর যতটা না মনোযোগ ছিল, তার চেয়েও বেশি আগ্রহ ছিল আমার কবিতা আমাকে আবৃত্তি করে শোনানোর প্রতি। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে শুনেওছিলাম–

ভিক্ষা যদি করিই, হব রাজভিখিরি
সোনার থালা ধরব মেলে–
দিতে চাইলে মোহর দিও রাজকুমারী,
মোহর দিও, মোহর দিও, মোহর দিও।

কানাকড়ির চেয়ে আমার শূন্য থালা, সোনার থালা
অনেক দামি।
তাই সামান্য দিলে আমার ভরবে না মন–
ভিক্ষা যদি করিই, তুমি মোহর দিও।

রাজকুমারী, তোমাকে চাই। নেই অর্ধেক রাজত্বে লোভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজমুকুটের লালসা নেই, সিংহাসনে বসার চেয়ে
তোমার পায়ের কাছে বসে থাকা
অধিক প্রিয়।
তাই সামান্য দিলে আমার ভরবে না মন,
ভিক্ষা যদি করিই, তুমি মোহর দিও।

এর পরপরই তসলিমা আমাকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিল তার *সকাল কবিতা পরিষদের* অনুষ্ঠানে। লিখেছেও সেকথা তার *ক*-এ। কিছুটা তাচ্ছিল্য করেই। যেভাবে সৈয়দ শামসুল হক তার কলাম থেকে তসলিমার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বই বের করেন, সেরকমই কাটছাঁট করে। যা ঘটেনি, অর্ধসত্যের সঙ্গে সেরকম অনেক পূর্ণমিথ্যারও উল্লেখ আছে। যা ঘটেছিল, উল্লেখ নেই তেমন অনেক কিছুর। অতসীর কথা এসেছে চিঠিতে। আসেনি, অতসীকে লেখা আমার চিঠি নিয়েই কলকাতায় যাওয়ার কথা। গিয়ে অতসীর বাবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা। আরও আসেনি, সেই চিঠির জন্যই আমার খালি বাড়িতে ছুটে আসার কথা। তসলিমার *নির্বাচিত কলাম* বইটির নাম আমারই দেওয়া। *ক*-এ তার উল্লেখও আছে। উল্লেখ নেই– *লজ্জা* নামটিও সে আমার প্রকাশিতব্য একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। আমার একটি কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি তার খুব পছন্দ ছিল– 'আয় সোহাগী ঝেঁপে/ শরীর দেব মেপে'। 'শরীরতত্ত্ব' নামের এই কবিতাটি আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কয়েক বছর পর সেই কবিতার অনুকরণে একটি বইয়ের নামকরণ করলে (*আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেবো মেপে*) শামসুর রাহমান তসলিমাকে বাহবা জানিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন– "তুমি ছাড়া কে লিখতে পারত 'আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেব মেপে'?" এ-নিয়ে একদিন শামসুর রাহমানের সঙ্গে মজাও করেছি– "মেয়েদের প্রতি আপনার আপনার পক্ষপাত অপরাধের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তসলিমার কবিতার চুরি-করা চিত্রকল্প দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখে ফেললেন; আর আমার আসল চিত্রকল্পটা এতদিনে নজরেই পড়ল না?"

নিজের গলার যে-হার খুলে একদিন আমার গলায় পরিয়ে দিতে চেয়েছিল নাসরিন, আমি গ্রহণ করিনি; সেই হারই সে মিলনকে পরিয়ে দিয়ে শয্যাসঙ্গী হয়েছে– সেকথাও জানা হল *ক* পড়ে। অথচ এর একশ ভাগের একভাগ বলায় বইমেলার মাঠে কী ক্ষিপ্তই না হয়েছিল সে আমার ওপর। *ক*-এ তার উল্লেখও আছে। উল্লেখ নেই, কলকাতা থেকে ফিরে একটি গদ্যও লিখেছিল সে *খবরের কাগজে*, যে-গদ্যে তার একাকী-ভ্রমণের বিবরণ ছিল– কোনও ইমদাদুল হক মিলন ছিল না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এও মনে পড়ছে, কলকাতা থেকে ফিরে জাতীয় কবিতা উৎসবের দিন তসলিমা দুই সেট চন্দন কাঠের বোতাম উপহার দিয়েছিল আমাকে। আমি একজোড়া নিজের জন্য রেখে আরেক জোড়া শামসুর রাহমানকে দিতে বলেছিলাম। তসলিমা কথা রেখেছিল। আমার সামনেই উপহার দিয়েছিল সেই বোতাম বড়কবিকে। শামসুর রাহমান অবশ্য জানতে পারেননি– চন্দন তিনি নাসরিনের হাত থেকে পেলেও, পেছনের ইচ্ছেটা ছিল আমার।

তো, সবকথাই তসলিমাকে লিখতে হবে, তা আমি বলছি না। গাছের শুধু কাণ্ডই না– গুঁড়িও থাকে। অতএব কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনও মানুষ গাছের বর্ণনায় শুধু কাণ্ডকেই প্রকাণ্ড করে দ্যাখায় না। তসলিমা তাই দেখিয়েছে। ক-এর পৃষ্ঠা ওল্টাতে-ওল্টাতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ে গেল– 'আসলে কেউ বড় হয় না, বড়র মতো দেখায়।' মনে পড়ল, *সকালের* সেই কবিতা অনুষ্ঠানটির কথা, অখ্যাত নাসরিন যখন আজকের বিখ্যাত তসলিমার চেয়ে স্বচ্ছ ছিল। আরও মনে পড়ল, সেই অনুষ্ঠানে পাঠ করা আমার 'তুলাদণ্ড' কবিতাটির কথাও–

তোমার চোখের চেয়ে বেশি নীল অন্য কোনও আকাশ ছিল না
যেখানে উড়াল দিতে পারি

তোমার স্পর্শের চেয়ে সুগভীর অন্য কোনও সমুদ্র ছিল না
যেখানে তলিয়ে যেতে পারি

তোমাকে দ্যাখার চেয়ে নির্নিমেষ অন্য কোনও দ্রষ্টব্য ছিল না
যেখানে নিমগ্ন হতে পারি

তোমাকে খোঁজার চেয়ে বেশি দূর অন্য কোনও গন্তব্য ছিল না
যেখানে হারিয়ে যেতে পারি।

কেবল তোমার চেয়ে বেশি দীর্ঘ তুমিহীন একাকী জীবন।

ময়মনসিংহ থেকে ফিরে-ফিরেই তসলিমার ফোন পেলাম। ফোনে-ফোনে ভেসে এল তার নতুন কবিতা। শিরোনাম– 'সম্প্রদান'। আমার দুটি কবিতার জবাবে লেখা। যেন আমার 'মোহরপ্রার্থী' আর 'তুলাদণ্ড' কবিতা দুটি আমি ওকে নিয়েই লিখেছি। যেন– 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান/শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে আত্মসম্প্রদান।' আমার কবিতা দুটি পরে আমার *অব্যর্থ আঙুল* ও *শ্রেষ্ঠ কবিতায়*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকলিত হয়। তসলিমারটা আছে ওর *নির্বাচিত কবিতায়*। সে যাই হোক, তসলিমার 'সম্প্রদান' ওর নিজের আবৃত্তিতে শুনেছিলাম কবিতাটির জন্মদিনেই–

একবার ভিক্ষা চাও
এ হাত আমার হাত, এই হাতে খুদকুঁড়ো ওঠে না কখনো
দিতে হলে মোহরই দেব।

কড়া নেড়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়াও ভিক্ষুক
কড়া নাড়ো, কড়া নাড়ো
জীবনের অযুত বছর ঘুম
একবার পারো তো ভাঙাও।
এ চোখ আমার চোখ, এ চোখের চেয়ে
বেশি নীল অন্য আর আকাশ কোথায়?
তোমাকে মোহর দেব। ভয় নেই।

ভিক্ষা চাও। চেয়ে দেখো
আমি আর যা কিছুই পারি
একবার দু'হাত বাড়ালে
তাকে আমি ফেরাতে পারি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতিকলা শিখে এসো, বনমালী কথায় মজে না

'সম্প্রদানে' নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলেও নাসরিনকে আমি গ্রহণ করতে পারিনি তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষদের মতো। একসময় তাকে বন্ধু বলে এবং বন্ধুত্বকে মহার্ঘ বলে জানতাম। সেই তসলিমাকে বাংলাদেশ ও ভারতের পর পশ্চিমা মিডিয়াও পণ্য করেছে। আমাদের মিডিয়া সবে pre mass market ছাড়িয়ে mass market-এর যুগে প্রবেশ করছে। পশ্চিমা মিডিয়া mass market ছাড়াও demassification বোঝে। আরও বোঝে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য কাকে কখন কীভাবে পণ্য বানাতে হয়। ভায়েগ্রা বাজারজাত করার আগে, এমনকী বৃদ্ধ পুরুষদের মাথাতেও বীর্য তুলে দিতে, তাদের একজন তসলিমাকে দরকার ছিল। ভায়েগ্রা বাজার পেয়েছে। তসলিমার আবেদন ফুরিয়েছে। ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তারা তসলিমাকে। আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে সেই ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন নিয়ে বাংলাদেশেই। একসময় তাকে আমি 'নাসরিন' নামে চিনতাম। সৈয়দ শামসুল হক তসলিমার ব্রার হুকে হাত রেখেছিল, মধুশয্যায় মিলনসঙ্গী করেছিল ইমদাদুল হক মিলন– এই সব অর্ধসত্যেরও কোনও প্রমাণ হাজির করেনি তসলিমা। প্রমাণ ছাড়া, যুক্তি ছাড়া সবই অচল। কোনও পুরুষও তো লিখে বসতে পারে– "এই তসলিমা একদিন তার শান্তিনগরের খালিবাড়িতে আমার শিশ্ন ধরে টানাটানি করেছিল।" –লিখলেই তা সত্য হয়ে যায় না। তার পেছনে কিছু যুক্তি-প্রমাণও থাকতে হয়।

নিজের ভাঁড়ার শূন্য বলে সহোদরার ভাঁড়ারের দিকেও হাত বাড়িয়েছে তসলিমা। আতাউল করিম ইয়াসমীনের পাজামার দড়িতে হাত চালিয়েছিল, সেই কাহিনীও হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে এখন। কবে কোন বান্ধবী তাকে স্বমেহনের গল্প শুনিয়েছিল, তা-ও। জ্যোতিষীদের মতো অন্যের মনের খবরও রাখতে হচ্ছে।

নিজের বেশ কিছু কবিতার উল্লেখ আছে তার নতুন বইয়ে। বেশিরভাগই নবিশি কবিতা। একটি কবিতার প্রথম কয় পঙ্‌ক্তি এরকম– "প্রতিরাতে আমার বিছানায় শোয় এক নপুংশক পুরুষ/ চোখে/ঠোঁটে/চিবুকে/উন্মাতাল চুমু খেতে খেতে/ দুহাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুঠো করে ধরে স্তন।/মুখে পোড়ে চোষে।" এ প্রসঙ্গে আমাকে জড়িয়ে লেখা তসলিমার বক্তব্য এমন– "শাহরিয়ার বলে, তোমার ওই *মুখে পোরে চোষে* লাইনটি বাদ দিয়ে দাও। কেন বাদ দেব! কারণ মুখে পোরে চোষে ব্যাপারটি অশ্লীল! হা! ছলে বলে কৌশলে যে শাহরিয়ার আমার স্তন মুখে পুরতে, চুষতে চেয়েছিল, সে আমাকে শ্লীলতা শেখাচ্ছ!" এখানেও সেই অর্ধসত্য আর পূর্ণমিথ্যার আলো-আঁধারি খেলা। একথা অসত্য নয়, কবিতাটি নিয়ে তসলিমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল টেলিফোনে। ভালো যে লাগেনি ঐ লাইনটি, বলেছিলাম সে-কথাও। কিন্তু বলিনি আমি, 'অশ্লীল'। বাদ দেওয়ার কথা? তা-ও না। বরং আমি ওকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনীর ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো' পঙ্‌ক্তিটি শুনিয়ে বলেছিলাম, "শুধু স্তন নয়, যোনীও আছে জীবনানন্দের এই লাইনটিতে; কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে। তোমারটা লাগছে না। জীবনানন্দেরটা কবিতা হয়েছে; তোমারটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন।

ঐ 'ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন' কথাটা শুনলেই তসলিমার মনে হত ওকে আমি হুল ফোটাচ্ছি। ওর বইয়েও এই হুলের প্রসঙ্গও এসেছে– "শাহরিয়ার এমনই। নির্বিকার হুল ফুটিয়ে যায়।"

AMARBOI.COM

অপ্রিয় সত্যকে যে তুমি নিজেও ভয় পাও, সে-কথা আমি জানি, নাসরিন। কিন্তু কবে থেকে তুমি জ্যোতিষীও হলে? জানলে কী করে যে, আমি তোমার স্তন মুখে পুরতে, চুষতে চেয়েছিলাম? তোমার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষদের মতো সেই স্তন আমাকে কাছে টানতে পারেনি বলেই তোমার যত ক্ষোভ, সে-কথা কী আমি বুঝি না? তা না-হলে, যে-আমি চাষার ভাষায় কবিতা লিখি, সে তোমার ঐ সামান্য 'স্তনে'ই অশ্লীলতা দেখতে যাব কেন? তোমার কথা ধার করে আমি বললেই বরং ঠিক হত– "হা! স্কেচ এঁকে, চিঠি লিখে, জবাবী কবিতায় নিজেকে 'সম্প্রদানে' সমর্পণ করে যে-নাসরিন ছলে বলে কৌশলে আমার শিশ্ন মুখে পুরতে, চুষতে চেয়েছিল, সে আমাকে অশ্লীলতা শেখাচ্ছে!" তুমি আটকে থাকতে পারো শামসুর, শক্তি আর সুনীলের কবিতায়, বাঙলা কবিতার পাঠক এগিয়ে গেছে। তাদের অনেকেই আজ আমার কবিতার এইসব 'অশ্লীল' চিত্রকল্পের সঙ্গে পরিচিত–

০১.

আমার বউয়ের নাম কাঁচাসোনা, তোমাদের মতো বুকে কাঁচুলি পরে না
স্তনে মুখ ঘষে দিয়ে চলে আসি, ঝাঁপিখোলা-ঝাঁপিবন্ধ নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০২.
স্তনে কি যৌনতা শুধু আঁতুড়ের দুধধানও আছে।
তুমি যদি টোডাকন্যা, বুকে কেন বসনপ্রহরা?

০৩.
তোমার বুকের মাপে চাঁদ ওঠে সাহেব বাজারে।

০৪.
আজ ধর্ষকের দিন, কৃষ্ণ গেছে দূর পরবাসে।
ইতিহাস মাথা গোঁজে মৌলবাদী শিশ্নসমাবেশে।

০৫.
যে-চিৎপোকার গল্প করেছি, সে কাঁঠালের আঠা। প্রেমে না এঁটুলি হলে টান পড়ে রসের ভাঁড়ারে। বলেছি তো ডেঙ্গু নয়, কামজ্বরে ধরেছে তোমাকে। ঘরের পুরুষে দেহ মজে গেছে, যেতে হবে আয়ুর্বেদিকে। বড়ুকে তো চেনো, মানে আমাদের বড়ু চণ্ডীদাস? ঘড়া-ঘড়া আদিরসে ভরা তার বাড়ির উঠানে। যাবে তো এখনি চলো, তালগাছ একপায়ে খাড়া। বাকিরা হিজল, তারা ফেট্টি বেঁধে সেজেছে বেহারা।

AMARBOI.COM

০৬.
তোমাকে ঘষিব বলে কিনিয়াছি পিতল-পালিশ
মেঝেতে মাদুর পাতো, লাগিবে না বিছানা-বালিশ।

০৭.
চাঁদের দিয়াড়ি হাতে হেঁটে যায় রতিগন্ধা রাত।
শ্মশানে নেমেছে শিব, শাকচুন্নি উরু পেতে বসে :
জোয়ান ভূতের পাতে তুলে দেয় পার্বতীর স্তন।

আমি সেই শ্মশানের শিব, যাকে দেখলে জোয়ান ভূতের পাতে শাকচুন্নির দল পার্বতীর স্তন তুলে দেয়। সে-কারণেই, মুখে পোরা দূরে থাক, তোমার বাড়িয়ে দেওয়া এঁটো স্তন আমি হাতেও তুলে নিতে পারিনি। একসময় আমার কবিতা পড়ে কবিতা লিখলেও বিখ্যাত হওয়ার পর তুমি আর বাংলা কবিতার খোঁজ-খবরই রাখো না। রাখলে ঐ 'অশ্লীলতা'র বানোয়াট গল্পটা ফাঁদতে না। আমি জানি, সঙ্গমেই তোমার কামের সমাপ্তি। ক পড়ে যে-কারও সেকথাই মনে হবে। তোমর সব দৌড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ সঙ্গম পর্যন্তই। কিন্তু তখনও আমার শুরুই হয় না। সেকথা আমার কবিতা থেকেই শোনো–

সঙ্গমে তোর সমাপ্তি আর তখনও যার হয়নি শুরু
সেই বদ্ধপাগল এবার হয়েছে তোর শিক্ষাগুরু।
যে-কেউ তোকে বিছিয়ে শোবে, তুই কি তেমন শীতলপাটি?
আমি হলাম লাঙল-জোয়াল, তুই হয়ে যা চাষের মাটি।

এই নে আমার পেশির আদর, উপুড় করে দিলাম ঘড়া;
চাষার যদি তাগদ থাকে মাটিই কি হয় অনুর্বরা?

অতএব তুমি 'দ্যাখ শালা কত বড় ক' লিখলেই পার পেয়ে যাও না। নাঈম, মিনার, মিলন, জালাল থেকে শুরু করে কায়সার পর্যন্ত অনেকেই তোমাকে শীতলপাটির মতো বিছিয়ে শুয়েছে– তুমি নিজেই লিখেছে তোমার সুবিশাল ক-এ। সেই শীতলপাটি-ডাক আমি ফিরিয়ে দেব, আমার বাছবিচারী স্বভাব তো সেকথাই বলে। তার জন্য তোমার ক্ষোভ থাকতেই পারে। সেই ক্ষোভ তুমি কীভাবে প্রকাশ করবে, সেটা একান্তই তোমার ব্যাপার। তোমার ভাষায় 'আমাদের সুন্দর বন্ধুত্ব'টি রক্ষা করার জন্যই আমার কাছ থেকে নিজেকে তুমি দূরে সরিয়ে নিয়েছিলে। কিন্তু আমি আর আমার কবিতা জানি, সব বন্ধুত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিচ্ছেদের বীজ– 'বন্ধুত্ব মানেই তুমি বিচ্ছেদের চুক্তি মেনে নিলে।' অর্থাৎ সেদিনই আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, পঁচিশ বছর আগে কোনও এক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যখন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

তোমার ক লোকের মুখে-মুখে। খুব শিগগিরই তার কথা ভুলেও যাবে মানুষ তোমার *লজ্জা* বইটির মতো। কারণ সস্তা যৌনতা ছাড়া সে-বইয়ে মনে রাখার মতো কোনও মহার্ঘই নেই। অথচ কবেকার অখ্যাত বইও আমি ফিরে-ফিরে পড়ে আনন্দ পাই। ক-এর মতো সেই সব বই নিয়ে কোনও হইচই নেই বাজারে। নেই তো কী? লোকে লোকারণ্য সোনাগাছির পাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও নেই। তবু সেই বাড়ির নির্জনতা আমার প্রিয়। সেই নির্জনতার চেয়ে সোনাগাছিরই বেশি কদর আজকের বাজার-দুনিয়ায়। তাই যে-শামসুর রাহমান কোনও অনুজের বই নিয়ে কদাচিৎ কথা বলেন, তিনিও কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান তোমাকে নিয়ে। শুনতে পাই, তোমার বইয়ের জের টেনে সৈয়দ হককে নিয়ে রিপোর্ট করায় তিনি এক তরুণ সাংবাদিকের চাকরি খেয়ে ফেলার হুমকিও নাকি দিয়েছেন টেলিফোনে। তোমার ছবির চেয়ে বড় আকারে তার ছবি ছাপিয়ে সাফাই-রিপোর্ট করতে বলেছেন। টানবাজার নেই; বাংলা সাহিত্যের সব হইচই এখন সোনাগাছি আর তোমার বইকে ঘিরেই। এ আর নতুন কী? অনেক আগেই টুকে রেখেছি সে-কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার পঙ্‌ক্তিতে–

> আগেও বলেছি কেন ধন্দে পড়ি কলকাতায় গেলে। ট্রামে কাটা পড়েছিল ধানসিড়ি, সেকথা তো জানো? সকলেই নদী নয়, কেউ-কেউ নদী। বাকিরা নিমিত্ত, তারা সল্টলেকে মদ্যপান করে। আমি কেউ নই তবে মাঝেমধ্যে কলকাতায় যাই। জোড়াসাঁকো জনশূন্য, লোকে লোকারণ্য সোনাগাছি। আমাকে চেনে না কেউ, না-চেনায় ভালো বেঁচে আছি।

না-চেনার অনেক লাভ। হোমারের *ওডিসি* পড়া থাকলে তুমিও জানো– দৈত্য পলিফেমাসের প্রশ্নের জবাবে গুহায় বন্দি ওডিসিয়াস নিজের নাম বলেছিল– "কেউ না।" বদ্ধ গুহায় জলপাই কাঠের বল্লমে পলিফেমাসের চোখ কানা করে দিয়েছিল ওডিসিয়াস। সাহায্যপ্রার্থী পলিফেমাস চিৎকার করে প্রতিবেশী দৈত্যদের ডেকেছিল। ছুটেও এসেছিল তারা। গুহার বাইরে থেকে জানতে চেয়েছিল, "কী হয়েছে?"

পলিফেমাস বলেছিল, "আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে।"

"কে?"– ফের প্রশ্ন করেছিল প্রতিবেশী দৈত্যরা।

পলিফেমাস বলেছিল, "কেউ না।"

সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা দৈত্যরা ভেবেছিল, পলিফেমাসের মাথায় গোলমাল দ্যাখা দিয়েছে। এগিয়ে এসেও ফিরে গিয়েছিল তারা।

তোমার দশাও এখন অন্ধ পলিফেমাসের মতোই। পৃথিবীজোড়া নাম হয়েছে তোমার। কিন্তু নারীরাও তোমাকে বিশ্বাস করে না। কারণ তোমার লেখার পরতে-পরতে আছে তাদের প্রতিও অনেক বিদ্বেষ। আরও আছে অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা। হাসান আজিজুল হক বা সনৎকুমার সাহার মতো কেউ একরৈখিক প্রশংসা করলেই তোমার কাছে 'ভালো মানুষ'। নইলে সে আহমদ ছফার মতো 'মামদো ভূত' কিংবা হুমায়ুন আজাদের মতো 'নিতান্তই বালক' কিংবা রফিক আজাদের মতো 'দুর্মুখ' কিংবা মালেকা বেগমের মতো 'নগ্নভাবে যুক্তিহীন' কিংবা ফরিদ কবিরের মতো 'শেওড়া গাছের ভূত' কিংবা নাঈমের মতো 'উঁচু দাঁত, উঁচু কপাল' কিংবা কিংবা ফরিদা আখতারের মতো 'হাড়গিলে মহিলা'।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল মহৎ প্রেমই নমশূদ্র, সংহিতাও ভয় পায় তাকে

শামসুর রাহমান আর ঐশ্বর্যশীলাকে তসলিমাই প্রেমের আশ্রয় দিয়েছিল তার বাড়িতে। একথা ফাঁস করে দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, তা এক ধরনের যৌনবিকৃতি। সেই বিকৃতি তসলিমার মধ্যেও বিদ্যমান। এর বিপরীত একটি গল্পও আমার জানা আছে।

প্রেমের অপরাধে আবুবকর সিদ্দিক যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বন্ধু-সতীর্থ-সহকর্মীদের অনেকেই তখন এই বিপন্ন মানুষটির নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়িয়েছেন। মান-সম্মানের ভয়ে বাড়ির দরজা থেকেই আবুবকরকে তাড়িয়ে-দেওয়া তথাকথিত প্রগতিশীলের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এইসময় খুব দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে আবুবকর সিদ্দিক একদিন শামসুর রাহমানের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছেন, ফিরে যাওয়াই বোধহয় ভালো; কী জানি, এ-বাড়ি থেকেও হয়তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্তু না, শ্যামলীর ঐ বাড়িটি পৃথিবীর সমস্ত প্রেম ধারণ করতে জানে। শামসুর রাহমান নিজেই দোতলা থেকে নেমে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সতীর্থ কবিকে। বলেছিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে সব কুৎসাই আমি শুনেছি। দেশের নামি-দামি কবি-লেখকরাই সেই কুৎসা রটিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে প্রেম চিরকালই মহান। আপনি সেই প্রেমের জন্য আজ দণ্ডিত। পৃথিবীর সব দরজাও যদি আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, শ্যামলীর এই বাড়ির দরজা খোলা থাকবে।"

তো, এইখানেই শামসুর রাহমান আর তসলিমা নাসরিনের মধ্যে পার্থক্য। কবি আর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপকের মধ্যে।

সমাজের, এমনকী লেখকদেরও, সমালোচনায় আবুবকর সিদ্দিক যখন তলিয়ে যাচ্ছেন এক অপরিচিত চোরাবালির মধ্যে, তখন শামসুর রাহমানই তাকে হাত বাড়িয়ে নতুন মাটিতে টেনে তোলেন। একরাতে আমার জিগাতলার বাসায় এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্না চেপে রাখতে পারেননি আবুবকর সিদ্দিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ বারবার ভিজে যাচ্ছিল। বার-বার রুমাল বের করছিলেন তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে। বলছিলেন তাদের কথাও, যারা তার নামে এই কুৎসা রটিয়ে তাকে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে হাসান আজিজুল হকের কথাই বেশি করে বলছিলেন তিনি।

অথচ এই আবুবকর সিদ্দিকই আবার প্রেমের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন *মানবজমিনে*– সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ যখন বিদিশাকে বিয়ে করল, তখন। বিদিশা আবুবকর সিদ্দিকের মেয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি খোয়া যাওয়ার পর মেয়ে ও মেয়ের মায়ের সঙ্গে আবুবকরের সম্পর্ক কেঁচকে যায়। বিদিশা এরশাদকে বিয়ে করার সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রী-কন্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগটি হাতে পেয়ে গেলেন একদা প্রেমের কারণে শামসুর রাহমানের বাড়িতে আশ্রয়-পাওয়া কবিটি। *মানবজমিনে* প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি পড়ে আমি ব্যথিত হয়েছিলাম। আমার মতো শামসুর রাহমানও। এ-নিয়ে আমার আর শ্যামলীর কবির মধ্যে একদিন কথাও হয়েছিল একপ্রস্থ। এর একসপ্তাহ পরই আজিজ মার্কেটের দোতলায় আবুবকর সিদ্দিকের সঙ্গে দ্যাখা। আমি তাকে ঐ সাক্ষাৎকারটির কথা জিগ্যেস করতেই তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে যা বললেন, তার অর্থ– কথাগুলো ছাপা হবে জেনে *মানবজমিনের* ঐ রিপোর্টারকে বলেননি তিনি। সেটা ছিল রিপোর্টারটির সঙ্গে তার একান্তই ব্যক্তিগত আলাপ।

ব্যক্তিগতই হোক আর সমষ্টিগত, কথাগুলো তিনিই বলেছেন কিনা জানতে চাইলে আবুবকর চুপ। আবুবকর সিদ্দিক আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা-ই দিইনি, তখনই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তবু তাকে না-বলে পারিনি– "আপনি যা পারেন না, এরশাদ তা পারেন। যে-ছাত্রীটির সঙ্গে আপনার প্রেম ছিল, তাকে আপনি বিয়ে করার সাহস রাখেননি। কিন্তু চাকরিটিও খুইয়েছেন। আপনি বোকা প্রেমিক। তাই আম-ছালা দুটোই গেছে আপনার। আগের সংসারটাও হারিয়েছেন। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এরশাদ সাহসী। জামাইকে আপনার একগুচ্ছ রজনীগন্ধা দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসা উচিত।"

আবুবকর সিদ্দিক রজনীগন্ধা নিয়ে এরশাদের কাছে গিয়েছিলেন কিনা, সেকথা আমার আর জানা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যত গল্প আছে, সীমান্তের কাঁটাতারে ঘেরা

যে-হাসান আজিজুল হক প্রেমের বিরুদ্ধে কুৎসা রটান (আবুবকর সিদ্দিকের অর্ধসত্য), তার সম্পর্কে তসলিমা তার *ক*-এ লিখেছে– "বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হক আমাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান, আমার সম্পর্কে স্তুতিবাক্য আওড়ান। আমি তো মঞ্চে বসে স্তুতির তোড়ে ভেসে যেতে থাকি।" এবং সনৎকুমার সম্পর্কে তার বক্তব্য– "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা লিখেছেন, 'তসলিমা নাসরিন আজ আমাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক।"

যে-শামসুর রাহমান তার পরবর্তী প্রজন্মের কোনও প্রতিভাবান কবিকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কবিতা-বিশদে একটিও গুণবিচারী গদ্য লেখেননি, তিনিও তসলিমাকে তসলিম জানিয়ে কলাম লেখেন। তসলিমার বাড়িতে *লজ্জা* নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মননচর্চাও করেন নির্মলেন্দু গুণ ও বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে।

প্রশংসায় কে না খুশি হয়! তবে তসলিমা একটু বেশিই প্রশংসাকাঙাল। তার *ক*-এ একটু পর পরই পাওয়া যাবে নিজের সম্পর্কে নিজের প্রশংসাসূচক বাক্য। যেমন, 'কিন্তু শাহরিয়ার এমনই মুগ্ধ *সকালের* বৃন্দআবৃত্তি শুনে যে ঢাকায় গিয়ে *স্বরশ্রুতি*কে জানায়' বা 'খবর বেরুচ্ছে, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন আর তসলিমা নাসরিন এই তিনজনের বই বিক্রির শীর্ষতালিকায়' বা 'ওদিকে *লজ্জা* নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে' বা '*লজ্জা* নিয়ে হইচই মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, কমছে না' বা 'বাংলা সাহিত্যে আনন্দ পুরস্কার হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। সবচেয়ে নামি। বাংলাদেশের কেউই এ পর্যন্ত এ পুরস্কার পায়নি। আর আমি সেদিনের এক লেখক, তাও শখের লেখক, শখে কবিতা লিখি, প্রয়োজনে কলাম লিখি, আমি কিনা পাচ্ছি এই পুরস্কার!'– আত্মপ্রশংসায় ভরপুর এমন অসংখ্য-অজস্র বাক্যেরও সমবায় তসলিমার *ক*। অতএব *ক*-কে তসলিমার আত্মপ্রশংসার দলিলও বলা যেতে পারে।

আত্মপ্রশংসা আত্মহত্যারই সামিল। *ক*-এ তসলিমা সেই আত্মহত্যাই করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

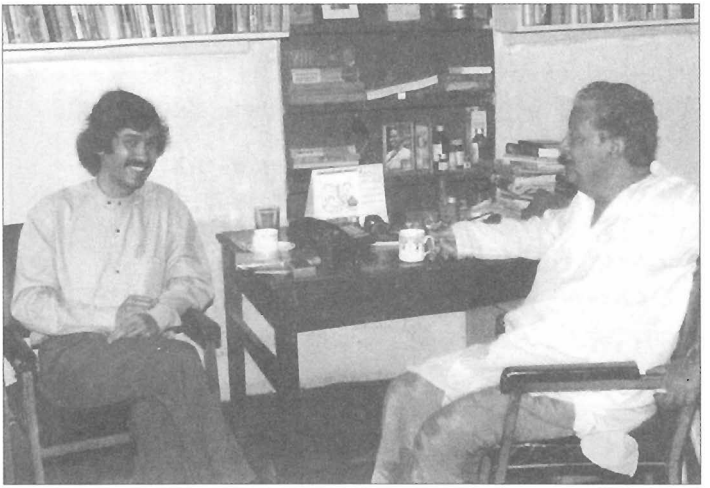

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার কলকাতার শাসমল রোডের বাসায়

গ্রন্থকারের জিগাতলার বাসায় মনিরা কায়েস ও আনিস রহমানের সঙ্গে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহের কবিতার বন্ধুরা

আমাদের আশীর্বাদ,

অনিয়ম নিয়ে কাজ চালাচ্ছি বলে আমাকে আমার
লেখার কাজ নিয়ে। আমি ও আছি-নিয়ে আছি। শরীরও তেমন
নাজুক না। এখন আমি অবিশ্রাম কাজ করি না বলেই
তোমাদের দিকে তাকাই। চিঠি দিয়ে যাচ্ছি। গত
চিঠিটি নকল করতে দেব মনস্থ।

দুটি দেশ ও জাতিগোষ্ঠী আজ — সেকালে তারা শত্রু
ছিল। এর আগে তোমাকে বলি। আর তোমাকে
এ বিষয়ে ভাবতে বলি। এমন আমাদের হয়
দিয়ে থাকবে। তোমার চিন্তায় থাকবে।

আমার হয় এ নিয়ে কাজ করতে। আমার মনে
উদ্যোগ (আমার নয় — তার মনের) তাকে
মনে প্রকাশের পরে হয়ে আমার কাজটি
এমনভাবে অনিয়ম বিনিময়ের মধ্যে কোন অন্তিত্ব
হত।

আমার ভালোবাসা নিও।

শ্যামল
২৬/৮/৯৭

Shyamal Gangopadhyay
79, Deshapran Sasmal Road
Flat—14, Calcutta-700 033
472-0626

গ্রন্থকারকে লেখা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*মহাভারতে*র একটি গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফেলে অর্জুন হঠাৎ উদাসীন হয়ে পড়লে যুধিষ্ঠির তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। অর্জুনের গাণ্ডীব কেড়ে নিয়ে যুদ্ধরত অন্য রাজাদের হাতে তুলে দিতে চায় যুধিষ্ঠির। এতে অর্জুন বড় ভাইকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কারণ, কেউ গাণ্ডীব কেড়ে নিতে চাইলে সে তাকে হত্যা করবে, এমনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল অর্জুন। এইসময় পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা কৃষ্ণ হত্যার বিকল্প উপায় বাতলে দেয় অর্জুনকে। বলে– "মানী লোককে গালিগালাজ করলেই তাকে হত্যা করা হয়।" কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন বড় ভাই যুধিষ্ঠিরকে খিস্তি-খেউড়ে তুলোধুনো করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। কিন্তু পিতৃতুল্য অগ্রজকে গালিগালাজ করায় খানিক পরেই অর্জুনের মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। সন্তপ্ত অর্জুন এবার আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এবারও কৃষ্ণ বিকল্প উপায় বাতলে দেয় অর্জুনকে– "আত্মপ্রশংসাই আত্মহত্যার সামিল। সবাইকে শুনিয়ে নিজের প্রশংসা করলেই তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।" অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শ মতো নিজের প্রশংসায় নিজেই আত্মহারা হয়ে তার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটিও রক্ষা করে।

ক-এ তসলিমা একদিকে মানী লোকদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় করে তাদের হত্যা করেছে; অন্যদিকে আত্মপ্রশংসার মাধ্যমে আত্মহত্যা করেছে নিজেও। এবং কে না দেখছে, তসলিমার ক ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্রই বাঁধিয়ে দিয়েছে দুই বাংলার লেখকপাড়ায়। যারা একদিন তসলিমাকে মাথায় তুলেছিল, তারাই আজ তাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এমনকী কলকাতার আনন্দবাজারীরাও তাকে সহ্য করতে পারছেন না। শীর্ষেন্দু, সুনীল থেকে শুরু করে সুবোধ সরকার পর্যন্ত সবাই কোমর বেঁধে নেমেছেন তসলিমার বিরুদ্ধে। শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাসের ভূত এতক্ষণে নিশ্চয় খোদ শীর্ষেন্দুর কানে-কানেই বলতে শুরু করেছে– "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, নিজেরই তোর বুদ্ধি কম।"

তসলিমাকে আনন্দবাজারিরা তাদের মর্জিমাফিক কলম-ধরানোর পোষা-লেখক বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার বাগিয়ে, বইয়ের জন্য মোটা টাকার লেখক-সম্মানী নিয়ে সটকে পড়েছে সে। তসলিমা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, দেরি করলে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ বা আবুল বাশারের মতো তাকেও শেকল পরিয়ে বারদুয়ারে বেঁধে রাখা হবে। তাই হত্যাই হোক আর আত্মহত্যাই– ক (পশ্চিমবঙ্গে *দ্বিখণ্ডিত*) লিখে তসলিমা আনন্দবাজারিদের পাছায় কষে একটা লাথি মারতে পেরেছে, যে-লাথি তাদের অনেকদিনের পাওনা। পূর্ণেন্দুপত্রীসহ অনেকেই তা মেরে যেতে পারেননি। শয়ে-শয়ে প্রচ্ছদ-ইলাস্ট্রেশন করার পরও মৃত্যুর পর পত্রীকে সম্মান জানিয়ে *দেশ* একটি সংখ্যাও করেনি। এই কাগজটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের কবি-লেখকদের নাম ভুল করে। এক্ষেত্রে *আনন্দবাজার-দেশ* আমাদের *ইনকিলাব-*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামের মতোই সাম্প্রদায়িক। তো, সবার পক্ষ থেকে তসলিমা সেই খেলাপি ঋণই পরিশোধ করেছে। এ-জন্যও তাকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে।

তবে *আনন্দবাজারকে*-মারা লাথিটা তসলিমার খারিজ হয়ে যায় একটাই কারণে— ঐ প্রতিষ্ঠানের বাজারি পুরস্কারটাকেই সে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মনে করে। এমন অসংখ্য-অজস্র বিরোধাভাস থাকায় পুরো *ক*কেই মামুলি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাড়া কিছু মনে হয় না। একই লাথি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও মেরেছিলেন। *আনন্দবাজারকেই*। সেই লাথির দাগ এখনও প্রতিষ্ঠানটির পাছা থেকে মুছে যায়নি। শ্যামলের *কুবেরের বিষয়-আশয়* যে পড়েছে, সেই জানে, বাংলা সাহিত্যের কত বড় কুবের ছিলেন তিনি। শ্যামলের *সময় বড় বলবান* নামের চটি আত্মজীবনীটির কথাই যদি ধরি, খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত তসলিমার ব্যক্তিগত বিজ্ঞানসমগ্রও সেই চটি বইয়ের ভার বইতে পারবে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শাসমল রোডের বাড়িতে আমি একাধিকবার গিয়েছি। তিনিও আমার জিগাতলার বাড়িতে এসেছেন। এসে মনিরার সঙ্গে, কমলের সঙ্গে, আনিসের সঙ্গে টানা আড্ডা দিয়েছেন। কলকাতায় ফিরে-ফিরেই কমলের চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছেন। সেরকমই একটি চিঠিতে একবার আমাকে তিনি 'কবিতার রাজপুত্র, আমাদের শাহরিয়ার' সম্বোধন করেছিলেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সম্বোধন আমার কাছে কয়েক হাজার আনন্দ পুরস্কারের চেয়ে বড়— এই কথা বুঝতে হলে তসলিমাকে আরও একবার জন্ম নিতে হবে। এই শ্যামল বাংলাদেশের ক্যান্সার-আক্রান্ত দুঃস্থ কবি কমল মমিনের চিকিৎসার জন্য উদগ্রীব হয়ে নিজের একটি বইয়ের রয়েলটির পুরো টাকাই দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

আবার এই ঘটনাগুলোর মধ্যেও অনেক-অনেক অর্ধসত্য চাপা পড়ে আছে। কমল মমিনকে তখন নব্বইভাগ আশঙ্কামুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিৎসক। দুস্থও আর নয় সে। ধানমণ্ডির অভিজাত ফ্ল্যাটেই থাকে। কিন্তু তখনও দুস্থ-দুস্থ ভাব করে কমল তার অসুস্থতার খবর সবাইকে জানায়। শুধু ঐ খবরটুকু জানানোর জন্যই তার সকল লেখালেখি। এই অভাবকাতর লেখা পড়ে শিশির শীলসহ অনেকেই তাকে নিয়ে লেখালেখি করেন। শেখ হাসিনাও তার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ান। *কথকতার* সম্পাদক জামিল আখতার বীনু তার নিজের টাকায় কমলের বই ছাপান। বই বিক্রি করে এক লাখেরও বেশি টাকা কমল মমিনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তারপরও কমলের মেয়ের পড়ার খরচ হিসেবে প্রতিমাসেই দেড় হাজার করে টাকা ধরিয়ে দেন কমলের বউয়ের হাতে।— প্রতিদান হিসেবে শিশির শীলকে দেখলে কমল মুখ ফিরিয়ে নেয়। শেখ হাসিনার নামই শুনতে পারে না। জামিল আখতার বীনুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীকে আর দেখতে যায় না— এমনকী মৃত্যুর দিনেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথাপ্রগতিশীলদের মতো আমি শুধু *বাইবেল-পুরাণ* থেকেই নয়, *কোরান* থেকেও অনেক মূল্যবান পাঠ নিই। *কোরানে* অকৃতজ্ঞ মানুষ সম্পর্কে বার-বার সতর্ক করা হয়েছে। সূরা দাহ্‌র-এর আয়াত ৩-এ আছে– "হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, নয় সে অকৃতজ্ঞ।"– কমলের অকৃতজ্ঞতা থেকেও আমি শিক্ষা নিই। কমলকে আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম জামিল আখতারের সঙ্গে। বন্ধুর ঋণ তো আমারই শোধ করা উচিত। সে-ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে আমি জামিল আখতার বীনুকে আমার একটি বই উৎসর্গ করি। এর পর-পরই একদিন শুনি, তার অসুস্থ স্বামীটি আর নেই। ছুটে যাই ইস্কাটনের শোকসন্তপ্ত বাড়িটিতে। তারপর কিছুদিন যখন স্বামীহারা জামিলা আখতারকে সান্ত্বনা দিতে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছি ঘন-ঘন, একদিন তিনি জানতে চান, "কমল কেমন আছে? তোমাদের দুলাভাইয়ের মৃত্যুর খবরটা ও জানে তো?"

জামিলা আখতারকে আমি বলতে পারি না– কমল তখন হোটেল শেরাটনের লাউঞ্জে বসে নতুন কাউকে তার দুস্থতার গল্প শোনাচ্ছে।

অথচ কমলের ক্যান্সার নিয়ে যে-শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্বেগের শেষ ছিল না, নিজের ক্যান্সারের কথা কাউকে বুঝতে না-দিয়েই তিনি নিঃশব্দে চলে যান। ক্যান্সার-আক্রান্ত মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কাছেও এই নৈঃশব্দকেই সম্মানজনক মনে হয়েছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে মিডিয়া তুমি সেখানেই হাঁ-বদনে হাসো

ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ। তসলিমার মধ্যেও সেরকম অনেক ভালো আছে। সেগুলোকে উপেক্ষা করে কেউ যদি এককথায় *ক* বইটিকে নাকচ করে দেয়, তো ভুল করবেন। আবার কেউ যদি তসলিমার কথাগুলোকেও পূর্ণসত্য ভেবে বসেন, তারাও ঠকবেন। জগতে পূর্ণসত্য বলে কিছু নেই। কিন্তু তসলিমার প্রচারপটুতা তার অর্ধসত্যগুলোকেও কমজোরি করে দিয়েছে। আমি যতদূর চিনি তসলিমাকে, আত্মপ্রচারের জন্য সে সবই করতে পারে। হ্যাংলার মতো আব্দার করতেও তার আত্মসম্মানে বাধে না। তার আব্দারেই আমি *স্বরশ্রুতি*র অনুষ্ঠানে *সকাল কবিতা পরিষদ*কেও অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিলাম। যদিও *ক*-এ সেকথা একটু ঘুরিয়ে লিখেছে তসলিমা। কথার চালাকিতে নিজেকে বড় করে দেখিয়েছে।

নাঈমের *খবরের কাগজে* কলাম লেখার আব্দারও তসলিমার দিক থেকেই এসেছিল। সে-সুবাদেই নাঈমের সঙ্গে তাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। *খবরের কাগজে* তখন আমার 'উদোররপিণ্ডি' কলামটি ছাপা হচ্ছে। তসলিমা সেই কলামের এক নম্বর ভক্ত। আমার প্রতিটি এপিসোডেরই প্রশংসা করে। আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে লেখার পরামর্শও দেয়। তার কিছু-কিছু পরামর্শ ভালো লাগলে তাকে বলেছিলাম, "তুমি নিজেই লিখছো না কেন?"

জবাবে তসলিমা খুবই প্রসন্ন, "আমার লেখা কি নাঈম ছাপাবে?"

ওর আব্দারের ভঙ্গিটি এরকমই। বুঝে নিয়ে বললাম, "কেন ছাপাবে না? নাঈম নতুন লেখকদের সম্মান জানাতে জানে।"

পরের সপ্তাহেই তসলিমা ঢাকায় চলে আসে এবং ওকে আমি নাঈমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই *খবরের কাগজে*র নয়াপল্টনের অফিসে। এই *খবরের কাগজ* প্রথম সিদ্ধেশ্বরী থেকে আলী রীয়াজ বের করতেন। শুরুতে কাগজটি ব্রডশিটে বেরুত। পরে নাঈমের সম্পাদনায় ম্যাগাজিন সাইজ হয়। আমি সিদ্ধেশ্বরী থেকেই *খবরের*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*কাগজে*র আড্ডায় জড়িত। তখনও লিখেছি। নাসরিন যুক্ত হল নয়াপল্টনে। আমার 'উদোরপিণ্ডি'র একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবেই নিজের পরিচয় দিল সে নাঈমের কাছে। 'বুধোর ঘাড়' আমার তখনও দ্যাখার বাকি ছিল। এক যুগ পরে ক-এ দেখলাম।

তবে আব্দার যদি পূরণ না-হয়, চোখ ওল্টাতেও দেরি হয় না তসলিমার। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ না-করে পারছি না। ১৯৯২-৯৩ সালের কথা। সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস ডলার ঐ কলেজেরই শেফু নামের এক সদ্য পিতৃহারা ছাত্রীকে জোর করে বিয়ে করতে চাইলে মেয়েটির পরিবারের লোকজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। *ভোরের কাগজে* তখন 'প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু' শিরোনামে বিপদগ্রস্ত মানুষের চিঠি ছাপা হত। গণমুখী এই আইডিয়াটি ছিল আনিসুল হকের। প্রধানমন্ত্রী বরাবর শেফুর একটি মানবিক চিঠি সেখানে ছাপানোর ব্যাপারে আমি শেফুর পরিবারের লোকজনকে সহযোগিতা করি। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে 'কী জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী' শিরোনামে একটি কলাম লিখি *আজকের কাগজে*। মাহমুদুর রহমান মান্নাকে অনুরোধ করলে তিনিও শেফুর প্রসঙ্গ টেনে *ভোরের কাগজে* লেখেন। এই দুটি লেখার কারণে ঘটনাটির ওপর প্রশাসনের নজর পড়ে। অথচ তখন পর্যন্ত শেফুকে আমি চোখেও দেখিনি। একদিন মাত্র ফোনে কথা বলে জানতে চেয়েছিলাম, ডলার কি শেফুর প্রেমিক, নাকি আদপেই সন্ত্রাসী। আর যা জানার, তা তার দুই ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি। আমার পৈতৃকবাড়িও সিরাজগঞ্জের কড্ডাকৃষ্ণপুর গ্রামে। 'কৃষ্ণপুর' উঠে গিয়ে এখন শুধুই 'কড্ডা'। সেই সূত্রেই শেফুর পরিবারের লোকজন আমার কাছে এসেছিল।

আমার স্কুলজীবনের এক বন্ধু তখন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করছে। ক্যাপ্টেন তারিক। এখন মেজর বা লে. কর্নেল। সারারাত আড্ডা পেটানোর নাম করে তারিক আমাকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা দুই বন্ধু আর তারিকের বউ একসঙ্গে রাতের খাওয়া খাই। কুমিল্লা জিলা স্কুলের বন্ধুরা কে কী করছে, তা নিয়ে গল্প করি। গেস্টরুমে আমার শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই রাত দুটো পর্যন্ত দু-বন্ধুর সুখ-দুঃখের পাঁচালি চলে। ঘুমে আমার ঢুলুনি আসতেই তারিক ভেতরের ঘর থেকে একটা ব্রিফকেস নিয়ে আসে। ব্রিফকেসের ডালা খুলে আমার আর মাহমুদুর রহমান মান্নার সেই লেখা দুটির কাটিং বের করে দ্যাখায়। তারপর বন্ধুত্বের দাবি ফলিয়ে বলে– "কী লিখেছিস এইসব তুই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে? রাজনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে?"

আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসার কারণটা তখনই ধরতে পারি। বুঝতে পারি, তারিক এখন আর আমার বন্ধু নয়– সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। অতএব আমিও তখন আমার শাদাকাগজের স্বাধীন সম্পাদক। সেই দূরত্ব রেখেই ওর প্রশ্নের জবাব দিই, "শুধু এই জন্যই তুই আমাকে তোর বাসায় ডেকে এনেছিস? শুধু চাকরির প্রয়োজনেই? তাহলে তুইও শোন তারিক, আমার কোনও দল নেই; আমি নিপীড়িতবাদী। লেখাটা আমি একজন বিপন্ন শেফুকে নিয়ে লিখেছি; প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে নয়। তোর একটা রিপোর্টের ওপর মেয়েটার অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

তারিকও আর কথা বাড়ায়নি। নিঃশব্দে ওর শোবার ঘরে চলে গিয়েছিল।

তারিকের রিপোর্টের কারণেই কিনা জানি না, এক সপ্তাহের মধ্যেই শেফুকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় সিরাজগঞ্জে। থানার যে-দারোগা শেফুর পরিবারের কেসই নিতে রাজি ছিল না, সে-ও তখন চাকরির মায়ায় ঐ পরিবারের লোকজনের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। শেফু আর শেফুর পরিবার এভাবেই রক্ষা পেয়েছিল ডলারের হাত থেকে।

তো, মাহমুদুর রহমান মান্নাকে করা অনুরোধ আমি তসলিমাকেও করেছিলাম। একই দিনে। কিন্তু আমার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তসলিমা অবলীলায় বলেছিল, "লিখতে পারি, যদি তুমিও আমাকে নিয়ে একটা গদ্য লেখো।"

আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম 'নারীবাদী' তসলিমার সেদিনের আচরণে। সেই বিস্ময় কাটতে সময় লাগেনি বেশি। তসলিমা যে নেহায়েতই এক প্রচারলিপ্সু ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপক, খ্যাতির মোহে বিপন্ন নারীদের ব্যবহার করে মাত্র– সেকথা ততদিনে দেশের নারী-আন্দোলনের নেতা-কর্মীরাও জেনে গেছেন। তাই মহিলা পরিষদের সভাও তসলিমার পক্ষে কথা বলে না। তার জন্য মালেকা বেগমকে এক হাত দেখে নিয়েছে তসলিমা তার ক-এ। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের নির্যাতিত নারীরা বিপদকালে মালেকা বেগমদের অল্প-স্বল্প কাছে পেলেও তসলিমাকে কখনোই ত্রিসীমানায় দেখতে পায়নি। কোনও বিপন্ন নারী নয়, তসলিমা বরাবর পুরুষের সান্নিধ্যই কামনা করেছে। 'শরীরের প্রয়োজনে শরীর বিনিময়' করেছে যত্রতত্র। তসলিমার 'নারী' যে ব্যবহারের উপকরণ মাত্র, সেকথা সে নিজের অজান্তে নিজেই স্বীকার করেছে ক-এ– "আমি কি আসলে আমার নিজের জন্য নূরজাহানকে ব্যবহার করছি!"

যাই হোক, শেফুর সেই ঘটনাটির পর থেকে আমি আর তসলিমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। হঠাৎ কোথাও দ্যাখা হয়ে গেলেও এড়িয়ে গেছি। এবং তসলিমাও তারপর থেকে আমার ওপর ক্ষুব্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটে না মিলিলে মাথা, কোথায় ধরিব বলো ছাতা?

সেদিন তসলিমার যে-অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি, আজ আমার গদ্যে কিছুটা হলেও তা পুষিয়ে দিতে পারছি বলে ভালো লাগছে। এ নিয়েও তসলিমা ফোড়ন কাটতে পারে যে তাকে নিয়ে একটা বইই লিখে ফেলেছি আমি। যেমন আহমদ ছফাকে নিয়ে ফোড়ন কেটেছে। আমার এ-বই তসলিমাকে নিয়ে লেখা নয়। যদিও কোনও-কোনও পত্রিকায় সেরকমই ইঙ্গিত দিয়ে আগাম খবর বেরিয়েছে। এ-বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য– অধসর্ত্য। এই অর্ধসত্য আমার দর্শন। এই দর্শন আমি জীবন ঘেঁটে পেয়েছি। নদী ও নদীতীরবর্তী জনপদ ঘেঁটে পেয়েছি।

বাঙালির কোনও নিজস্ব দর্শন আজ আর নেই। একদিকে ধর্মান্ধ, অন্যদিকে মতান্ধ– এই হচ্ছে আমাদের চিন্তাপদ্ধতির অবস্থা। ধর্মান্ধরাই শুধু নয়, মতান্ধরাও সমান মৌলবাদী। অর্ধসত্যকেই তারা পূর্ণসত্য মনে করে গলাবাজি করে বেড়ায়। আর সেই অর্ধও তাদের নিজস্ব নয়। ধার করা। আমাদের সব জ্ঞানবুদ্ধিই ব্রিটেন-আমেরিকা কিংবা চিন-রাশিয়া কিংবা মক্কা-মদিনা থেকে আমদানি করা।

দার্শনিক চিন্তা দূরে থাক, বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাই আজ বিপন্ন। ইতালির আনাতোনিও গ্রামশি তার *দ্য ইন্টালেকচুয়ালস এ্যান্ড অন এডুকেশন* বইয়ে বুদ্ধিজীবীদের দুটি শ্রেণীতে বিভাজন করেছিলেন– 'জৈব' ও 'প্রথাগত'। জৈব বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে নিজেদের চিন্তায় সাধারণের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটান। আর প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরা নেহায়েতই নগরজীবী মামুলি বক্তা– জনগণের পাল্‌স তারা ধরতে পারেন না– ফলে জনবিচ্ছিন্ন কথাবার্তা বলেন। প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে-ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একসময় মুসলিম লীগের বিলুপ্তির কারণ ছিল এই প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরাই। আজকের আওয়ামী লীগও এদের কারণেই খুব ধীরে-ধীরে বিলুপ্তির পথে এগুচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দশ কি বিশ বছর পর এই দলের অস্তিত্বই থাকবে না কোনও। এখনই দলটির উচিত, দলের অথর্ব বুদ্ধিজীবীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোলাইখালে রেখে আসা। ধোলাইখালে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা মুনতাসীর মামুনই দেখিয়ে দিতে পারবেন। তিনি পুরানো ঢাকার ঐতিহাসিক পথ-ঘাট ভালো চেনেন।

আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা শুধু প্রথাগত বুদ্ধিজীবীই নয়, সেই প্রথাগতরা আবার মিডিয়োকার প্রথাগত। এদের সম্পর্কেই সক্রেটিস বলেছিলেন– "ওরা জানে না যে ওরা জানে না।" সক্রেটিসের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি না। তাই আওয়ামী বুদ্ধিজীবী দেখলেই দূরে-দূরে থাকি। যাই সাধারণ মানুষের কাছে, যারা জীবনের টাটকা খবরগুলো রাখে। অসাধারণভাবে সাধারণ তারা। তাই নির্বাচনের আগেই বলে দিতে পারে, জয়নাল হাজারির পাশে দাঁড়ানোর জন্য শেখ হাসিনা কত ভোট হারাতে যাচ্ছেন আর ক্ষমতা ছাড়ার পরও গণভবন না-ছাড়ার কারণে কত সম্মান ধুলোয় মেশাচ্ছেন। কোনও দল না-করলেও আওয়ামী লীগ নামের দলটির প্রতি আমার একটি নিভৃত সহানুভূতি আছে। কারণ এই দলটিতে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এক মহান কবি, পৃথিবীর মানচিত্রে যিনি বাংলাদেশ নামের কবিতাটি লিখেছেন। কৃষক আর মজুরদের প্রতি নিজের সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্টের কথা বলে পদত্যাগের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন তিনি দলের ৭৪ কি ৭৫ সালের জাতীয় অধিবেশনে। বলেছিলেন– "বাংলার কৃষক কালোবাজারি করে না; করে আপনার আমার মতো শিক্ষিত লোকেরা।" শেখ মুজিবের মতোই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীকটিও আমার প্রিয়– নৌকা। মানবসভ্যতার প্রাচীনতম বাহন এই নৌকা এখনও আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের ফিটন গাড়ি দেড় শ বছরেই জাদুঘরে স্থান নিয়েছে, কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগের নৌকা এখনও টিঁকে আছে হাজার জনপদে। চর্যার দোহা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের শুরু। সেই দোহাতেও আমরা নৌকার দ্যাখা পাই। নদী পাই। নদী তীরবর্তী জনপদ পাই। আমার নিজেরও প্রিয় বাহন নৌকা। নদী আর বজরা রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল। বজরায় ঘুরে-ঘুরেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে চিনেছেন। *ছিন্নপত্র* পড়লেই বোঝা যায় সেকথা। 'সোনার তরী' পড়লেও। ছোট সে-তরী নিজেরই সোনার ধানে ভরে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন– 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী/ আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।" বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ সোনার বাংলা বলতেন। শেখ মুজিবও। সেই সোনার বাংলাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নৌকা এখন সোনার ধানে নয়, বুদ্ধির ঢেঁকিতে গিয়েছে ভরি। বুদ্ধির এই ঢেঁকিদের কাছ থেকে রেহাই চেয়ে শেখ মুজিব অশিক্ষিত হৃদয়বানদের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। নগরজীবী শিক্ষিতরা সেদিন তা হতে দেয়নি। এদের বুদ্ধিই শেখ মুজিবের জন্য কাল হয়েছিল। মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনাকে এরাই ঘিরে রেখেছিল ক্ষমতার পাঁচ বছর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইন্দিরাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। যত না ইন্দিরাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে কবিতা লেখা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি লেখার মতো মানুষ শেখ হাসিনা। কিছুদিন তাকে কাছ থেকে দ্যাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দুই অগ্রজের সঙ্গে তার ধানমণ্ডির বাড়ির দোতলার পড়ার ঘরটিতেও গিয়েছি কয়েকবার। নিজের হাতে একদিন তিনি বাড়ির ভেতর থেকে ট্রে বহন করে এনে মিষ্টির প্লেট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখে ভেসে উঠেছিল গোলাপ নানার মুখ। এই গোলাপ নানা আমার মায়ের চাচা। সৈয়দ নজরুল ইসলাম নামেই দেশের মানুষ তাকে চেনে। আমার বাবা যখন আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষ, তখন গোলাপ নানার বাড়িতে প্রায় রোজদিনই যেতাম। আমাদের বাড়ি আর তার বাড়ি– মাঠের এপার আর ওপার। গোলাপ নানার মেয়ে লিপি, রুপা আর ছেলে শরিফের সঙ্গে আমার ভাব ছিল ছেলেবেলায়। নানাকে খালি গায়ে উঠোনে বসে গরুর দুধ দোয়াতে দেখেছি নিজের চোখে। ভাইঝির জন্য সেই দুধের ভাগ কাঁসার বাটিতে করে পাঠিয়েছেন। অনেকদিন আমি নিজেই বহন করেছি সেই বাটিভরা দুধ। আমার বাবা রাজশাহী থেকে ময়মনসিংহে বদলি হলে আমি আর আমার মেজবোন সুরমা তিনু মামার সঙ্গে আগেই ময়মনসিংহে চলে এসেছিলাম। এই তিনু মামার আরেক নাম মুজিবুর রহমান ফকির। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এখন আওয়ামী লীগ করেন। আমি কোনও লীগ-টীগ করি না– আমি মানুষ করি, কবিতা করি। এবং যারা মানুষকে ভালবাসেন, তাদের অনুসরণ করি। শেখ মুজিবকে সেকারণেই ভালবাসি। হাজার বছরে বাঙালি যে-দুচারজন উঁচুমানুষের দ্যাখা পেয়েছে, শেখমুজিব তাদেরই একজন। আমি আর আমার মেজবোন ছাড়া আমাদের পরিবারের আর সবাই যমুনার ফেরিতে উঁচু সেই মানুষটিকে পাশে বসে দেখেছে। আমার মায়ের গোলাপ চাচা তার ভাইঝিকে ফেরিতে পেয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ভাইঝিও তার সঙ্গের ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে খাইয়েছিলেন উঁচুমানুষটিকে। শেখ মুজিব আমার ছোটবোন মুন্নীকে কোলে নিয়ে আদর করেছেন। মুন্নী সেই গল্প করলে আমার মনে ঈর্ষা জাগত ছেলেবেলায়। আমারও ইচ্ছে হত শেখ মুজিবকে ঐরকম কাছে পাওয়ার। সেই সাধ পূরণ হয়নি এই জীবনে। তবে অনেকদিন পর শেখ হাসিনাকে কিছুদিন কাছ থেকে দেখে সাবেক সাধ কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছিলাম। একবারই গুলকি বাড়িতে রফিকউদ্দিন ভুইয়ার বাড়ির সামনের ছোট মাঠটিতে শেখ মুজিবকে আমি ১০০ হাতের মধ্যে পেয়েছিলাম। গোলাপ নানা সেখানে থাকলেও কাছে ঘেঁষতে পারিনি। সেটা ছিল পার্টির সভা। আমি ফিরছিলাম স্কুল থেকে। সালটা ১৯৭০। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিব দলকে সংগঠিত করতে তখন জেলায়-জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছোট-ছোট সভা করে বেড়াচ্ছেন সারা দেশে। ছোট-ছোট এই সভাগুলোই যে কত ইফেক্টিভ, আমাদের বড়-বড় রাজনৈতিক নেতারা তা জানেন না। এমন অসংখ্য ছোটরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগফল ৭ মার্চের উত্তাল জনসমুদ্র। শেখ মুজিব সাধারণের মন বুঝতেন। সেই মন তার মেয়ে শেখ হাসিনার মধ্যেও আমি লক্ষ করেছি, যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন না। কখনও মা, কখনও বোন কখনও মেয়ের মতো নির্মল মনে হয়েছে তাকে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি ধীরে-ধীরে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। নইলে কেউ লালন ছেড়ে ঠিকাদারদের পক্ষ নেয়? বাউলদের ভোট নেই বলেই কি ঠিকারদের পক্ষ নিতে হবে? বাউলভক্ত-লালনভক্ত অসংখ্য মানুষের ভোট যে হাতছাড়া হয়ে গেল তাতে? বড় দুঃখে একটা কবিতা লিখেছিলাম সেইসময়, যার একটি পঙ্‌ক্তি ছিল– "ভোটে না মিলিলে মাথা, কোথায় ধরিব বলো ছাতা?" হাসিনার তখন কবিতা পড়ার সময় কোথায়? তার চারপাশে তখন সেই বুদ্ধির ঢেঁকিরা– স্বর্গে গেলেও যারা চাটুকারিতাই করবে দেবতাদের। ঘাটের মাঝি যদি হিজলের গায়ে বন্যার দাগ দ্যাখাতে উদগ্রীবও হয়, কোনওদিনই সময় হবে না সেই দাগ দ্যাখার।

কী সেই দাগ? শামসুর রাহমানের সঙ্গে তার পৈতৃকনিবাস পাড়াতলী গিয়েছিলাম একবার শ্যালো নৌকায় দশ মাইল মেঘনা উজিয়ে। সঙ্গে ছিল কবির গোটা পরিবার। বাইরের লোক বলতে আমি আর ফজলুর রহমান। একাত্তরে এই পাড়াতলীতেই 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' ও 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা দুটির জন্ম। সেক্টর টুএর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক গোপনে এই কবিতা দুটো নিয়ে গিয়ে ছদ্মনামে ছাপিয়েছিলেন রণাঙ্গনের কাগজে। সেই গল্প আমি হাবিবুল আলমের মুখেই শুনেছি। এই আলম একাত্তরের অক্টোবরে হোটেল ইন্টারকনে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রেস মিডিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলেন– ইয়াহিয়া খানের কথা পূর্ণমিথ্যা; অর্ধসত্য এই যে, বাংলাদেশ নামের একটি দেশের জন্য বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করছে। (সত্যের বাকি অর্ধেক হচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্যও ছিল সেই যুদ্ধ, যা স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও বাস্তবায়িত হয়নি।) পাড়াতলীতেই শামসুর রাহমানের বাবা, মা ও ছোট ছেলে মতিনের কবর। এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি এই গাঁয়ে। কোনও মোটরযান নেই। নেই কোনও রিকশাও। বাচ্চুর বয়স এখন সত্তরের ওপর; হাঁটতে কষ্ট হয়; তাই শ্যালো নৌকায় একটা রিকশাও তুলে নিয়েছিলাম আমরা এপারের ঘাটেই। 'বাচ্চু' শামসুর রাহমানের ডাক নাম। 'মুন্সির বেটা' নামেই তিনি পাড়াতলীতে খ্যাত। মুন্সির বেটাকে বললেই পাড়াতলীতে বিদ্যুৎ আসবে, স্কুল সরকারি হবে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল হবে, কৃষিঋণ মওকুফ হবে– শামসুর রাহমানকে ঘিরে ধরে পাড়াতলীর মানুষ এইসবই ভাবে। সংবিধানের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন অসহায় শামসুর রাহমান। অন্যদিকে পাড়াতলীর লোকজন ভাবেন, মুন্সীর বেটার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুব ভাব। প্রায়ই বোধহয় কবিতা শুনতে যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকায় বয়ে-আনা রিকশায় পাড়াতলীর মেঠোপথে সস্ত্রীক শামসুর রাহমান

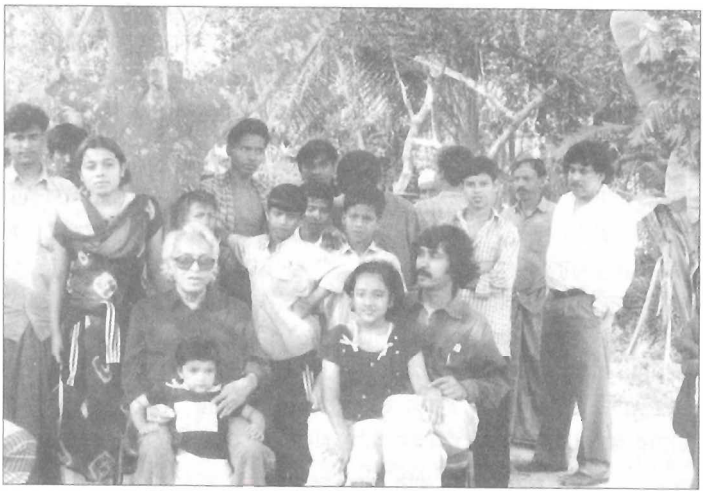

শামসুর রাহমানের পৈতৃক ভিটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বাচ্চুর শ্যামলীর বাড়িতে। অন্যায় কিছু তো তারা ভাবেন না— গান্ধী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে গেছেন একাধিকবার, নেহরু তার মেয়েকে সেখানে পড়তে পাঠিয়েছেন এবং ফ্রান্সের মিতেরাঁর সঙ্গে মার্কোয়েজেরও সেই ভাব-ভালবাসা ছিল। অসুস্থ সত্যজিতের হাতে সম্মাননার ক্রেস্ট-সনদ তুলে দিতে এই মিতেরাঁ ভারতেও ছুটে এসেছিলেন। বই না-পড়েও কত কী জানে পাড়াগাঁর মানুষ। বই পড়েও আমরা শহুরে লোকেরা অন্ধ। কত যে অন্ধ, তা ফেরার পথেই টের পাই। যে-ঘাট থেকে পাড়াতলী রওনা হয়েছিলাম, সেই ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ল, সূর্য তখন ডুবু-ডুবু। অদূরেই ব্রিজ। কংক্রিটের পিলারে আমরা বন্যার দাগ দেখতে পেলাম নোনার অবয়বে। গেলো বছরের বন্যা আর আটাশির বন্যা নিয়ে আমরা যখন গল্প করছি, তখন মাঝিদের কেউ একজন হাতের ইশারায় ঘাটের অদূরে পাড়ের হিজলেও সেই একই দাগ দ্যাখাল। আমরা সেই দাগ দেখতে পেলাম না। তখন সব মাঝিই এক সঙ্গে ইশারা করল।— মাঝিরা দ্যাখে, আমরা দেখি না। শামসুর রাহমান দেখেন না, আমি দেখি না, ফজলু দেখে না। সবাই আমরা গাছের বাকলে নোনার দাগ খুঁজি। তিনজনই আমরা মিডিয়ার লোক। চোখ তো আছেই, ক্যামেরার জুম লেন্সও হাতিয়েছি। কিন্তু ঘাটের হিজলে বন্যার দাগ দেখতে পাই না। আমাদের বোকামিতে মাঝিরা হাসে। যুবক মতো একজন দেখিয়ে দেয় সেই দাগ। গাছের কাণ্ডে দুই উচ্চতায় দুটি খোদাইয়ের দাগ— ওপরেরটা আটাশির, নিচেরটা গত বছরের। তবে কি হাশেম খানের মতো কেউ কুড়োল চালিয়ে গাছের বাকলে ঐ দাগ তৈরি করেছে বন্যার ক্রেডিট লাইন হিসেবে? এই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজি মাঝিদের কাছেই। জোয়ার-ভাটার নদী মেঘনা। আবারও হাসির জোয়ারে উপচে পড়ে মেঘনা পাড়ের লোকজন। আমাদের বোকামির জবাবে ছোট্ট করে উত্তর দেয়— "নাওয়ের গলুই ঠেকছে না? দাগ তো হইবই।"

হিজলের গায়ে বন্যার দাগ চিনতে না-পারা এই অন্ধ আমরাই কত কী চোখে দেখি আর পাবলিককে দ্যাখাই! খ্যাতির বাদুর হয়ে ঝুলে থাকি নাগরিক ইলেকট্রিক তারে। কোনও লাভ নেই তাতে। হাওড়ের দেশ ডুবিগাঁওয়ে গিয়ে দেখেছি, কেউ আমাদের খ্যাতির খবর রাখে না। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের পর এক জসিমউদ্‌দীন ছাড়া আর কোনও কবিকেই চেনে না ডুবিগাঁওয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষিত লোক এইট পাশ মাধব বর্মনও। পাড়াতলীতেও খুব বেশি হের-ফের নেই এই দৃশ্যের। বাচ্চু আর মুন্সির বেটাকে যতজন চেনে, ততজন শামসুর রাহমানকে চেনে না। খ্যাতি তাকে দূরের তারকা বানিয়েছে। পাড়াতলীর উঠোনে কদাচিৎ তিনি চাঁদের আলো হয়ে নামেন। অক্ষম আমি কবিতায় তুলে রাখি সেই অভিজ্ঞতা--

> বিদ্যুৎ আসেনি শুনে রাত্রি জাগে হরপ্পার চাঁদ। চরবাউলের মেয়ে
> পাড়াতলী মেঘনায় সাঁতার শিখেছে। গাজনের মেলা বসে মতিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবরের পাশে। রূপসী ডোম্বীরা আজও কুপি জ্বালে চর্যার দোহায়। বিরান মাঠের পাড়ে মুন্সিবাড়ি— ঢেঁকিছাঁটা প্রত্ন শিলালিপি। তারারা দূরের আলো, গরিবের ভিটেয় চরে না। চাঁদের হ্যাজাক জ্বেলে ঢেউ গোনে ঘাটের হিজল। খ্যাতির বাদুর ঝোলে নাগরিক ইলেকট্রিক তারে। ধীবর ভাসায় ডিঙি, দাঁড়ে বাজে জলের দোতারা। ফেরে না মুন্সির বেটা, ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, জীবনেরও মুদ্রণপ্রমাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্দ উচ্ছেদের আগে ছন্দ জানা অতি বাঞ্ছনীয়

আওয়ামী লীগে তবু বুদ্ধির ঢেঁকিরা আছেন, বিএনপিতে তা-ও নেই। শক্তির 'আসলে কেউ বড় হয় না বড়র মতো দেখায়' লাইনটির দু-একটি শব্দ বদলে দিয়ে বিএনপি সম্পর্কে বলা যায়– "এখনও সেটা দল হয়নি, দলের মতো দেখায়।' দলটি একটি রাজনৈতিক বিশ্রামাগার মাত্র। আওয়ামী লীগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যে-কেউই এই বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিতে পারেন। সন্ত্রাসীদের জন্যও সেখানে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। ইতিহাসবিস্মৃত ও সাম্প্রদায়িক লোকজনের পছন্দ এই দল। দলটি ক্ষমতায় এলে 'মালাউন' শব্দটি প্রকাশ্যে উচ্চারিত হতে শুরু করে। 'মালাউন'দের ঘর-বাড়ি দখল শুরু হয়।

ওদিকে নগরজীবী জ্ঞানমার্গীদের কবলে পড়ে বাম দলগুলোর অবস্থা তো বহু আগেই শোচনীয়। বিভিন্ন ইস্যুতে হইচই করে মিডিয়া-কভারেজ পাওয়া ছাড়া বাম দলগুলোর আর কোনও কর্মসূচি নেই।

অতএব স্বাধীনতাবিরাধী জামাত-শিবিরই এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। জৈব বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ছে দলটি।

আর তখন চোখ থাকিতেও অন্ধরা রাজনৈতিক তৃতীয় শক্তির আশায় ড. কামাল হোসেনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেশের বাম দলগুলোও কিছুদিন আগে একই আওয়াজ তুলেছিল। ঢাকায় বসে সুশীল আওয়াজ তুললেই যদি জনগণের সমর্থন পাওয়া যেত, তাহলে ঘরে-ঘরে একটা করে রাজনৈতিক দল থাকত। তেভাগার 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও' কর্মসূচি কবেই ছিনতাই করে নিয়েছে জামাত– সেই সত্য আমাদের জ্ঞানমার্গী বামদের জানা নেই। এই জামাতই এখন বাংলাদেশের তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি। এই দল এখন মাঠ-পর্যায় পর্যন্ত দুর্গ গড়ে তুলছে। সেই দুর্গ– শেখ মুজিব তার ৭ মার্চের ভাষণে যে-দুর্গ গড়ার কথা বলেছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে। অতএব ছিনতাই হয়ে গেছে মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠের মূলমন্ত্রটিও। আর ড. কামাল হোসেন তখন ভাবছেন, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে নিয়ে তিনি তৃতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তির উত্থান ঘটাবেন। ড. কামাল বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের রচয়িতা। সেই সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদটি উচ্ছেদ করে ধর্মনিরপেক্ষতার কবর রচনার মাধ্যমে যে-রাজনৈতিক দলের জন্ম, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী তার প্রতিষ্ঠাদের একজন। অতএব ডক্টর আর ডাক্তারের সমন্বয়ে তৃতীয় শক্তিটি যে কী হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। দুজনের একজন আওয়ামী লীগ থেকে এবং অন্যজন বিএনপি থেকে ছিটকে-পড়া খোঁড়া দৌড়বিদ। প্রকৃত দৌড়বিদদেরও দুজনকে যদি এক দড়িতে বেঁধে দৌড়তে বলা হয়, দুইয়ের যোগফল একেরও সমান হবে না। সেখানে ড. কামাল ও ডাক্তার বদরুদ্দোজার মতো খোঁড়া দৌড়বিদদের কাছে নতুন কিছু আশা করাও বোকামি।

এই যেদেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির দৌড়, সে-দেশে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনই যে বাজার পাবে, সে আর বিচিত্র কী?

অথচ নাগার্জুন, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, উদ্যোতকর, উদয়ন, কুমারিল, বাচস্পতির মতো বড়-বড় দার্শনিক একসময় আমাদেরও ছিল। সবাইকে বাদ দিয়ে যদি এক চাণক্যের কথাই ধরি, তিনি তার যুক্তিজালে সমকালের সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টেটলকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতা রাখতেন। আলেকজান্ডারের পরামর্শদাতা এরিস্টেটল তো আক্ষরিক অর্থেই ধরাশায়ী হয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা চাণক্য বা কৌটিল্যের কাছে। জগৎবিজয়ী আলেকজান্ডারের বিজয়যাত্রা রুখে দিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত রাজা এই চাণক্য বা কৌটিল্যেরই পরামর্শে। কৌটিল্য থেকেই 'কূটনীতি' শব্দটির জন্ম। রাজনীতি ছাড়াও অর্থশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল চাণক্যের। মার্কস তার রচণায় চাণক্যের *অর্থশাস্ত্রের* অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। এই চাণক্যই *কামসূত্রখ্যাত* বাৎস্যায়ন। সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন বলেই তার ভাবনার এখনও কদর আছে। তসলিমার মতো লেখকরা শুধু বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* থেকেই পাঠ নিয়েছে। সর্বশ্রাস্ত্র পাঠ? নৈবচ নৈবচ। শুধু তসলিমাই নয়, এ যুগের যে-কোনও লেখকই আড়াই হাজার বছর আগের চাণক্য থেকে যথার্থ লেখক হওয়ার পাঠটি নিতে পারেন। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে–

> সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
> সর্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ॥

> অর্থাৎ : একবার বললেই যিনি কথার অর্থ বোঝেন, লেখার ক্ষেত্রে যার হাত দ্রুত চলে, শব্দরাশি যার বশীভূত এবং সর্বশাস্ত্র যার অধিগত, তিনিই যথার্থরূপে লেখক।

লেখক হওয়ার মধ্যবর্তী দুটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম তসলিমা। অর্থাৎ, শব্দরাশি তার বশীভূত এবং লিখবার সময় কম্পিউটারে হাতও বেশ দ্রুতই চলে। কিন্তু শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্তটি (সর্বশাস্ত্র যার অধিগত) সে পূরণ করতে পারে না বলে প্রথম শর্তটিও (একবার বললেই যিনি কথার অর্থ বোঝেন) অপূর্ণ থেকে যায়। এই দুটি শর্ত পূরণ করতে হলে সাধারণের সঙ্গে ব্যাপক মেলামেশার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়, যা তসলিমার নেই। ব্যক্তিগত যৌনঅভিজ্ঞতাই (সেই অভিজ্ঞতা প্রাণীমাত্ররই আছে) তসলিমার একমাত্র পুঁজি। ধর্মান্ধও নয়, মতান্ধও নয়– তসলিমা যৌনান্ধ। অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে মিডিয়ার নজর কাড়াই তার প্রধান কাজ। মিডিয়া মানেই প্রচার, প্রচার মানেই প্রসার, প্রসার মানেই অর্থ– বাজারসাহিত্যের এই সূত্রটি সে ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে। খ্যাতির বাহুল্যে মানুষ ও প্রকৃতি থেকে সে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতির টানে গাড়ি নিয়ে গ্রামের পথে ছুটে গিয়েও পায়ের জুতোর কারণে মানুষের কাছে পৌঁছনো হয় না তার। একথাও সে লিখেছে ক-এ। আর অন্যদিকে নাচোল স্টেশনে বোরখাপরা ইলা মিত্র পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন মাটিবর্তী পায়ের কারণে। বোরখায় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেও পায়ের পাতায় লেগে থাকা সর্ষের হলুদই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল যে, তিনিই ইলা মিত্র। সেই সর্ষেমাখা পায়েই প্রণাম করে ইতিহাস; তসলিমার জুতোপরা পায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। খ্যাতি মানুষকে পতঙ্গস্বভাবী করে তোলে। তসলিমাকেও করেছে। 'টাবু ও টোটেম' নামে আমার একটি কবিতায় এই খ্যাতি নিয়ে কিছু কথা আছে–

খ্যাতিটা মুখোশমাত্র, লোকে দেখলে ভয় পায়, ভয়টুকু টাবু
যেমন বিবাহমাত্র তুমিও ছোঁয়াচে
উড়ে যাচ্ছ, দূরে যাচ্ছ, পড়ে যাচ্ছ নিয়মের আঁচে।

খ্যাতিরও বিপত্তি আছে, পতঙ্গস্বভাবে
যে-আলোকে মৃত্যুফাঁদ তারই কাছে যাবে।

যা রে খ্যাতি উড়ে যা রে আলোকে-আগুনে
আমি শুধু অন্ধকার চিনি
থোকা-থোকা মৃত্যু আর অমাবস্যা কিনি।

তামাটে রাত্রিরা ফেরি করে মৃত পাখিদের নাম
আমি মৃতদার করি টোটেমে প্রণাম
এসো টোডাকন্যা এসো আইনোকুমারী
আকাম্বা আমার দেশ, বাড়ি নিকোবাড়ি।

যে গেছে সে চলে গেছে বারোভাজা-তেরোভাজা প্রেমে
চির আদিবাসী মন মাথা কোটে টাবু ও টোটেমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিকে তাকাই দেখি প্রচ্ছদের উপরচালাকি

তবে ক-এর বিরুদ্ধে সৈয়দ শামসুল হকের মানহানির মামলায় আমার আপত্তি আছে। সেই মামলার কারণে ইতিমধ্যেই বইটির সব কপি বাজার থেকে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সৈয়দ হক অবশ্য বই বাজেয়াপ্ত করতে বলেননি, সেটা কোর্টের আদেশে হয়েছে। তবু এই ব্যাপারটি মনজুরে মওলাসহ অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাসে একথাই লেখা থাকবে যে, একুশ শতকের মতো সাইবার যুগেও এক লেখকের দায়েরকৃত মামলার কারণে বাংলাদেশ নামের একটি দেশে আরেক লেখকের বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ব্যাপারটি মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিরোধী। সৈয়দ হকের কিছু বলার থাকলে তিনি লিখেই জবাব দিতে পারতেন। মামলা করে তিনি তসলিমাকেই জিতিয়ে দিয়েছেন। হাতে কলম থাকার পরও তিনি কেন মামলার আশ্রয় নিলেন? এর ফলে পাঠকের মনে এমনও প্রশ্ন জাগতে পারে– তাহলে কি তসলিমার বক্তব্যকে খণ্ডন করার মতো কোনও জোরালো যুক্তিই সৈয়দ হকের কাছে ছিল না? খবরে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গেও নাকি সৈয়দ হাসমত জালালের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে *দ্বিখণ্ডিত* (ক-এরই আরেক নাম) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তসলিমার বইয়ের কারণে যত না মানহানি হয়েছে সৈয়দ হক কিংবা হাসমত জালালের, আমার মতে, তারচেয়েও বেশি সম্মানহানি হয়েছে মুক্তচিন্তার।

একালের নামী কবি-সাহিত্যের অধিকাংশই ব্যক্তিবলয়ের ঊর্ধে উঠতে অক্ষম। তসলিমার ক-এ এদের চরিত্রের এই দিকটি ভালোই ফুটে উঠেছে। তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য লালায়িত থাকেন। উচ্ছিষ্টের লোভে বিত্তবান অকবিদের সঙ্গে ওঠবস করেন। নিকট-সুন্দরীদের অসাহিত্যিক বিষয় নিয়ে যতখানি মাতামাতি করেন, একটি ভালো বই নিয়ে কখনোই তা করেন না। অধিকাংশই তারা বামন সাহিত্য-সম্পাদকদের তোয়াজ ক'রে চলেন। সম্ভাবনাময় তরুণদের ব্যবহারজীর্ণ ক'রে আবর্জনাস্তূপে ছুঁড়ে ফেলেন। আকাঙ্ক্ষিত নৈকট্য না-পেলে প্রতিভাবান মেয়েদেরও পাত্তা দেন না। বন্ধুকৃত্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদে অপাঠ্য বইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড়ক উন্মোচন করেন। ঘড়া-ঘড়া প্রশস্তিতেই শুধু তুষ্ট থাকেন– এক ফোঁটা সমালোচনাতেও ক্ষুব্ধ হন। সর্বোপরি, পদক-পুরস্কার-সংবর্ধনাসহ যে কোনও প্রকার নগদবিদায়ের আশায় কাঙালের মতো যত্রতত্র হাত পাতেন।

মহাভারতে আছে, কৌরবদের পরাজিত করার পর শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছ থেকে যুধিষ্ঠির বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের জন্য দানগ্রহণকে দোষণীয় জানিয়ে ভীষ্ম বলেছিল– গুণীর কাছ থেকে দান নিলে অল্পদোষ এবং নির্গুণের কাছ থেকে নিলে অধিক দোষ হয়। হালের কবিরা চরিত্রে সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণ। পরন্তু দানগ্রহণে তাদের কোনও বাছবিচার নেই। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেও দৃশ্যটা অন্যরকম ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বুদ্ধদেব বসু শুধু কবিতাই লেখেননি, সৎ-সম্পাদনা, বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিশ্লেষণী গদ্যরচনার মাধ্যমে উত্তরপ্রজন্মের জন্য সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমও রচনা করে গিয়েছিলেন। বিপরীতে সমকালীন কবি-লেখকদের অসাহিত্যিক কর্মকাণ্ডগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, এরা সার্কাসের ভাঁড়। এমনই ভাঁড় যে ইস্যু পেলেই এরা কাগজে-কাগজে প্রেসরিলিজ নিয়ে দৌড়ান। নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখলেই বর্তে যান। এমনকী সতীর্থের মৃত্যুকেও এরা নামপ্রচারের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই শোকপ্রকাশ ক'রে প্রেসরিলিজ দেন। খ্যাতিমোহে সারাক্ষণই 'আমি আমি' করেন। অপ্রিয় অর্ধসত্য উচ্চারণের সাহস তো নেইই, তা শুনতেও ভয় পান। যে মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সেই অর্ধসত্য, সেই মুখে তারা কুলুপ পরিয়ে দিতে চান।

AMARBOI.COM

কেন কুলুপ পরিয়ে দিতে চান? নইলে লোকে জেনে যাবে, খ্যাতিটা বাহুল্যমাত্র, যা ভাঙিয়ে তারা গুটিকয় মানুষ ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য কেনেন। যা ভাঙিয়ে তারা সরকারি প্লট বাগান এবং সর্দিকাশিতেই সরকারি টাকায় বিদেশে চিকিৎসা করাতে যান। গরিব দেশের লাখ-লাখ টাকায় বিদেশে চিকিৎসা করিয়ে এসে একবারও ভাবেন না, এই টাকায় একটা ছোটখাটো হাসপাতালই হয়ে যেতে পারত, যেখানে যক্ষ্মাক্রান্ত শহীদুজ্জামান ফিরোজের মতো কয়েক হাজার অসহায় কবি-লেখকের চিকিৎসা সম্ভব। সাহসী মুখে কুলুপ আঁটার চেষ্টা না-করে তারা যদি নিজেদের চোখ থেকে আত্মম্ভরিতার ঠুলি খুলে খালি-পায়ে নেমে আসতে পারতেন সাধারণের কাতারে, তাহলেই জানতেন অসাধারণভাবে সাধারণ ঐ মানুষগুলো থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে অনেক আগেই তাদের লেখক-সত্তার মৃত্যু ঘটেছে। না শাহবাগ আজিজ মার্কেটের তরুণরা, না ছোটকাগজকর্মীরা, না সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সংস্কৃতিকর্মীরা এদের আর শ্রদ্ধা করেন। তারা নিজেরা অন্ধ এবং ওঠবসও করেন অন্ধদের সঙ্গে– ফলে জানতেই পারেন না যে তাদের দিন গত হয়েছে। এরা তাকিয়ে থাকেন দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের দিকে। হয় তারা এই দলের–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় ঐ দলের। যখন নিজের দল ক্ষমতায় থাকে, তখন এরা শান্ত থাকেন। কিন্তু যখনই অন্য দলটিকে ক্ষমতায় দ্যাখেন তখনই 'গেল গেল' বলে চিলচেঁচামেচি শুরু করেন।– কী গেল? নিজেদের সুখ গেল, স্বাচ্ছন্দ্য গেল, সরকারি প্লট গেল, বিদেশসফর গেল। কিন্তু সেই কথা না-বলে তারা এমন ভাব দ্যাখান, যেন গোটা দেশই রসাতলে গেল। তসলিমাকে এরাই তৈরি করেছেন। *তসলিমা নাসরিন ক* এদেরই যৌথরচনা। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা, নির্মলেন্দু গুণ– প্রত্যেকেই এরা তসলিমার *ক* লিখেছেন। তসলিমার প্রশংসায় এদের সবাই একদিন একরৈখিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সারাদেশের অমিত সম্ভাবনাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাননি। মাটিবর্তী সংস্কৃতির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেননি– "আমি স্বখরচায় তোমাদের কাছে এসেছি। দেখতে এসেছি আমার উত্তরপ্রজন্মের কবি-লেখকরা কীভাবে তৈরি হচ্ছে।"– তাহলে তারাও শাদা চোখে অনেক অমিত অর্ধসত্যের দ্যাখা পেতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকলে হবে না জেনে কাণ্ড ছেড়ে শেকড়ে নেমেছি

৬ এপ্রিল ২০০১। ছোটকাগজ *দূর্বার* উদ্যোগে দিনমান কবিতা নিয়ে মেতে আছে স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা। কাগজটির তিন হরিৎ-প্রাণ কবিতাকর্মী সোহেল রহমান, গাজী লতিফ ও পীযূষকান্তি বিশ্বাসকে ঘিরে কবিতার ছন্দে-ছন্দে নাচছে গোপালগঞ্জ শহর। অনুষ্ঠান শুরু হতে তখনও কয়েক মিনিট বাকি। স্থানীয় পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে সভামঞ্চের সাজসজ্জা আর চেয়ার টানাটানি চলছে পুরোদমে। সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য কম *দূর্বার* কর্মীদের। তারপরও তাদের আছে গাজী লতিফের মতো এক আকাশহৃদয় কবি, যার উদারতার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে আমার একমুঠো ধুলোও মনে হয় না। এরকম একজন গাজী লতিফ যে-সংগঠনের আছে, সেই সংগঠনের কোনও কাজই আটকে থাকার নয়। ফলে গোটা গোপালগঞ্জ শহরই তখন কবিতার শহর। আর তখন আমাদের রাজনীতির দৃশ্যটি কেমন? গোপালগঞ্জে যখন *দূর্বার* অফুরন্ত সবুজ থেকে উৎসারিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অক্সিজেন, তখন ধোঁয়ার কার্বন উড়িয়ে শহরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে দীর্ঘ এক গাড়ির মিছিল। শুনতে পেলাম শহরে এসেছেন এক রাজকুমার। শেখ সেলিম তার নাম। গোপালগঞ্জের মানুষ তাকে বিপুল ভোটে জনপ্রতিনিধি করেছে গত নির্বাচনে। ভেবেছিলাম, এত মানুষের ভিড় দেখে গাড়ির বহর থেকে রাজকুমারও নেমে আসবেন। কবিতার সঙ্গে কাটিয়ে যাবেন কিছুটা সময়। আমার সেই ভাবনা পূর্ণমিথ্যা ছিল।

এবং এই হচ্ছে সংস্কৃতির প্রতি আমাদের রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ!

সেপ্টেম্বর ২০০১। একমাস পরই অনাহারী দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল উৎসব—জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটের পাখিরা মন-ভোলানো বুলি নিয়ে ওড়াউড়ি করছে সারা দেশে। ধরলা নদীর দেশ কুড়িগ্রামে তখন অন্য দৃশ্য। ৬,৭,৮ সেপ্টেম্বর তিন-তিনটে দিন সারা শহর মেতেছিল ভাওয়াইয়া আর কবিতার সুরে-ছন্দে। স্থানীয় *তরুণ লেখক ফোরামের* নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শহর ছাড়াও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে এক-দেড়শ তরুণ-তরুণী সাধারণ পাঠাগার মিলনায়তনে উপস্থিত হয়েছে। ৭ সেপ্টেম্বর ছিল মূল অনুষ্ঠান। সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলল বইপড়া, লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা, কবিতাসন্ধ্যা ও লোকসঙ্গীতের আসর। 'অক্ষরে অক্ষরে রচি এ মাটির পদাবলী' স্লোগানে মুখরিত ছিল উৎসব মঞ্চসহ গোটা কলেজ মোড় এলাকা। সারা দেশ যখন নির্বাচনী হুজুগে মত্ত, তখন ছোট এই জেলা শহরের ক্ষুদ্র এক সাহিত্য সংগঠনের ডাকে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে বইয়ের টানে, কবিতার টানে, গানের টানে– নিজের চোখে না-দেখলে এই দৃশ্য বিশ্বাস করাও কঠিন। স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন অধ্যাপক তপনকুমার রুদ্র। তার পাশে *তরুণ লেখক ফোরামের* সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালেক ফারুক ও আহসান হাবীব নীলু। তাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় ব্যস্ত আছে সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক ইউসুফ আলমগীর। তার নিষ্ঠা আর দায়িত্ববোধই তাকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যমণি করে তোলে। ছায়াবৃক্ষের মতো তাকে আগলে রাখেন এই শহরেরই এক আত্মমর্যাদাশীল ও প্রচারবিমুখ কবি– মিজান খন্দকার। ইউসুফের ডাকে পীরগঞ্জ থেকে এসি ল্যান্ডের জিপ হাঁকিয়ে কুড়িগ্রাম ছুটে আসে রহমান হেনরী। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুলতবি রেখেই। এই *কুড়িগ্রাম লেখক ফোরাম* তিনশরও বেশি পাঠচক্র করেছে সে পর্যন্ত। একটি পাঠচক্রের খবরও ঢাকার কোনও পত্রিকায় আসেনি বলে আমার ধারণা। শেরাটন-সোনার গাঁয়ের ফ্যাশন শোর খবর কোনও জাতীয় দৈনিকেই বাদ পড়ে না। বাদ পড়ে শুধু আমাদের শেকড়কাহিনীগুলোই। রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম এখন আলাদা-আলাদা জেলা হলেও একসময় এদের নিয়েই ছিল বৃহত্তর রংপুর। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় তিস্তা, যমুনা, ধরলা, আত্রাই, দুধকুমোর, ফুলকুমোর, ঘাঘট, করতোয়া প্রভৃতি নদীঅধ্যুষিত এই জনপদকে 'বাহের দেশ' নামে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করে এই অঞ্চলের মানুষ। 'বাবা হে', বা 'বাপু হে' থেকে 'বাহে'র উৎপত্তি– স্বজন সম্ভাষণে ব্যবহৃত ডাক। ৫ জেলার মানুষ একই ভাওয়াইয়ার সুরে বাঁধা। প্রশাসনিক বিভাজন মানচিত্রে পরিবর্তন আনলেও কৃষি ও প্রকৃতি বদলায়নি। মহাসড়কের দুইপাশে সার-সার কলাবাগান সেকথাই বলে। কাঁদি-কাঁদি কলায় শয়ে-শয়ে ট্রাক বোঝাই হচ্ছে দিনরাত– তারপর বারোমাসী এই ফল ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশের হাট-বাজারে। রংপুরের কলার ফলন মুন্সিগঞ্জের প্রাক্তন সুনামকেও ছাড়িয়ে গেছে। পাটকে ময়মনসিংহের লোক 'নাইলতা' আর রংপুরের লোক 'পাটা' বলে। একসময় পাট আর মাছই ছিল বৃহত্তর রংপুরের গাঁ-গেরামের লোকজনের প্রধান ভরসা। 'পাটা কাটা'র মৌশুম শেষ হলে দিনমজুর খাটতে বর্গাচাষীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজধানীর দিকে ছুটত। মঙ্গাপীড়িত এই জনপদে আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছে খনার বচন– 'কলা রুয়ে না-কেটো পাত/তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।' কিন্তু খনা ফিরলেও হক ফেরেন না। কুড়িগ্রাম শহরের এত বড় উৎসবে বাহের দেশের কবি সৈয়দ শামসুল হককে ফেলে আমাকে আনার কথা কেন মনে হল *তরুণ লেখক ফোরামের?*– এই প্রশ্নটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছিল আমার মনে। জানতেও চেয়েছিলাম উদ্যোক্তাদের কাছে। প্রথম যে-কারণটির কথা তারা বলেছিল, সেটা অর্থনৈতিক। সৈয়দ হকের মতো এলিট কবিদের আনতে হলে একজন কবির পেছনেই যা ব্যয় হয়, তা দিয়ে এ-জাতীয় মাঠ-পর্যায়ের সংগঠনগুলো বছরে নিজেদের লেখা নিয়ে দুইবার ছোটকাগজ প্রকাশ করতে পারে। দ্বিতীয় কারণটি আমি ঢাকার তরুণ কবিদের মুখেই একাধিকবার শুনেছি– কুকুর, দারোয়ান ডিঙিয়ে হকের আলিশান বাড়িতে ঢোকা আর বঙ্গভবনে ঢোকা একইরকম কঠিন কাজ।

ঢাকার বড় লেখকরাই যেখানে প্রান্তিক সাহিত্যের খোঁজ রাখেন না, সেখানে আর রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা কী রাখবেন। গোপালগঞ্জই বলি আর কুড়িগ্রামই– সবখানেই একই অবহেলা চোখে পড়ে।

মার্চ ২০০২। কবিবন্ধু ওমর কায়সার ও আখতার হোসাইনের আমন্ত্রণে চট্টগ্রামে এসেছি। উপলক্ষ *চট্টগ্রাম একাডেমি* আয়োজিত ৭ দিনব্যাপী 'স্বাধীনতার বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব'। ২৪ মার্চ কবিতাদিবস। আমার সঙ্গে ঢাকা থেকে জাফর ইকবাল জুয়েল এসেছে। আগেই পৌঁছেছেন বীর চট্টলার ছেলে মুহম্মদ নূরুল হুদা। বৌদ্ধমন্দিরে কাছে এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ চত্বরে ঢুকে আমরা বিস্মিত। আগের দিন সন্ধেয় ডিসি হিলে স্বাধীনতার বইমেলায় যেখানে লোকজনই চোখে পড়েনি তেমন, সেখানে এ কী কাণ্ড! উৎসব প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার জায়গা পর্যন্ত নেই। সূর্যসেন আর প্রীতলতা ওয়াদ্দেদারের দেশ চট্টগ্রাম। অতএব চট্টগ্রামের মানুষ ডিসি হিলের সরকারি-বইমেলা বর্জন করে *একাডেমি* আয়োজিত মুক্তচিন্তার বইমেলাতেই আসবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। বইমেলার নামও যে 'স্বাধীনতার বইমেলা'। আর কে না জানে, জোটের সরকারে স্বাধীনতা-বিরোধীরাও আছে। তাই ডিসি হিলের সরকারী বইমেলা ফেলে সবাই ভিড় জমায় *চট্টগ্রাম একাডেমির* বইমেলায়। এই মেলার অনেক বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই চোখে পড়ল স্টলের বিন্যাস– গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, শিশুসাহিত্য ইত্যাদির জন্য আলাদা-আলাদা স্টল। ফলে ক্রেতাদের অনেক সুবিধা। কবিতার পাঠক সরাসরি কবিতার স্টলে, উপন্যাসের পাঠক উপন্যাসের স্টলে ভিড় জমাচ্ছেন। উপন্যাসের কাটতি একটু বেশি তো হবেই; তাই বলে কবিতার পাঠকও নেহায়েত কম নয়। ছড়াকার+প্রকাশক+সাংবাদিক রাশেদ রউফও উদ্যোক্তাদের একজন। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

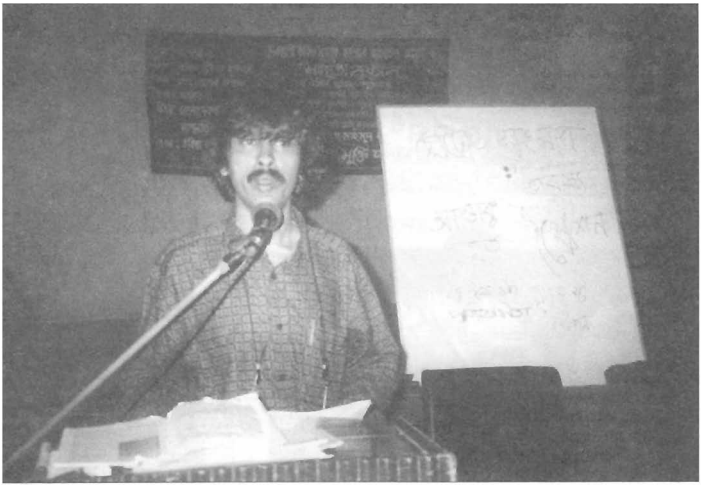

রাজবাড়ির মুক্তি *পাঠচক্রের* বইপড়া বিষয়ক কর্মশালায়

কুড়িগ্রাম *তরুণ লেখক ফোরামের* সদস্যদের সঙ্গে স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপালগঞ্জের দূর্বা আয়োজিত বসন্তবরণ অনুষ্ঠানে

চট্টগ্রাম একাডেমি আয়োজিত স্বাধীনতার বইমেলা ও কবিতা উৎসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনীর নাম *শৈলী*। ইতিমধ্যেই এই প্রকাশনী ঢাকার পাঠকদেরও নজর কেড়েছে। আমাকে দেখে রাশেদই ছুটে এল প্রথমে। কবিতা উৎসব শুরু হতে তখনও আধ ঘণ্টা বাকি। আমি রাশেদকে নিয়ে স্টলগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকি। ইতিমধ্যে দুয়েকটা বই কিনেও ফেলেছি, যার একটা আনোয়ারা আলমের লেখা *ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারী*। প্রীতিলতাসহ চট্টগ্রামের ২৭জন বীর নারীর জীবনী সূচিবদ্ধ হয়েছে এই বইয়ে। কয়েক পৃষ্ঠায় নজর বুলিয়েই বুঝতে পারি, মূল্যবান একটি বই। বইটির প্রকাশক রাশেদ রউফই পরিচয় করিয়ে দেয় লেখকের সঙ্গে। অমায়িক মহিলা আনোয়ারা। কলেজে অধ্যাপনা করেন। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর বাকি স্টলগুলোও ঘুরে শেষ করি। রাশেদ জানায়, এই মেলা শুধু চট্টগ্রামের লেখক+প্রকাশকদের মেলা। তাহলে যে অন্য জেলার লেখকদের বই দেখলাম? রাশেদই আমার ভুল ভাঙিয়ে দেয়, "চট্টগ্রামের লেখকের বই অন্য জেলা থেকে বেরুলেও এবং চট্টগ্রামের প্রকাশক অন্য জেলার লেখকের বই প্রকাশ করলেও এই মেলায় স্থান পাবে।" বুঝি, ঢাকার অনেক বড়-বড় প্রকাশনী থেকে বই বেরুলেও এই মেলায় আমার বইয়ের প্রবেশাধিকার নেই। যেহেতু আমি চট্টগ্রাম জেলার লোক নই এবং চট্টগ্রামের কোনও প্রকাশনী থেকে বইও বেরয়নি। মন খারাপ হয়। রাশেদই ভালো করে দেয় সেই মন– "আপনার একটা কবিতার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেবেন; আগামী বছর আপনার বইও থাকবে এই মেলায়।"– ঢাকার দিকে তাকিয়ে না-থেকে এই যে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর বলিষ্ঠ উদ্যোগ, শাদাচোখে একে আঞ্চলিকতা মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে যে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। এই চেষ্টা রাজশাহীর মানুষের মধ্যে থাকা উচিত তাদের গম্ভীরাকে এবং রংপুরের মানুষের মধ্যে থাকা উচিত তাদের ভাওয়াইয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ঢাকার দিকে তাকিয়ে থেকে এর সুরাহা নেই। চট্টগ্রামের বড়কাগজ, ছোটকাগজ, একাডেমি আর এই বইমেলার দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায়, বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই উদ্যোগেরই বিস্তার দরকার সারা বাংলাদেশে।। মিশেল ফুকো একেই বলছেন প্রান্তিকতা। চট্টগ্রামের একজন লেখক চট্টগ্রামে বাস করে, চট্টগ্রামের কাগজে লিখে, চট্টগ্রামের প্রকাশনী থেকে বই বের করে আনোয়ারা আলমের মতো লাইম লাইটে আসতে পারেন। বাংলাদেশের সব জেলাই *চট্টগ্রাম একাডেমির* কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এবং আমিও সোৎসাহে রাজি হয়ে যাই রাশেদ রউফের বইয়ের প্রস্তাবে। *চট্টগ্রাম একাডেমির* 'স্বাধীনতার বইমেলা'য় প্রবেশাধিকারের এই সুযোগকে আমার অনেক বড় পাওয়া বলে মনে হয়। একইরকম বড় মনে হয়, চট্টগ্রামের লোক না-হওয়া সত্ত্বেও মেলাবর্তী কবিতা উৎসবে আমাকে বিশেষ অতিথি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ হিসেবে ওমর কায়সার জানায়– "তুমি তো ঢাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নও, তুমি সারা বাংলাদেশের। *খোলা জানালা* থেকেই সেটা আমরা দেখে আসছি।"

বন্ধু+কবি+ছোটকাগজকর্মী ওমর কায়সারের এই কথাটিকে আমি অনেক বড় পুরস্কার হিসেবেই নিয়েছিলাম সেদিন।

৫ এপ্রিল, ২০০২। *মুক্তি পাঠচক্রের* উদ্যোগে রাজবাড়ি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনমান বইপড়া কর্মশালা এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মিলনায়তন উপচে পড়েছে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে! এই সাইবার যুগে ছোট্ট একটি জেলাশহরে এত ছেলেমেয়ে আছে বই পড়তে আগ্রহী? কিন্তু নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। অবিশ্বাস্য এই কাজটি, যিনি যায় একাই সম্ভব করেছেন, তার নাম সিদ্দিকুর রহমান। রাজবাড়ি জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক। তার সঙ্গে আছেন খোকন মাহমুদ, গোলাম আলী ও মাহমুদ হাসান। প্রথমজন কবি, দ্বিতীয়জন চিত্রশিল্পী ও তৃতীয়জন চিকিৎসক। নেপথ্যে একজন তানিয়া না-থাকলে একা সিদ্দিকুররা এত বড় কাজ করতে পারেতেন না। *মুক্তি পাঠচক্রের* বইপড়া কর্মশালার প্রধান সমন্বয়কারী আমি। খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে প্রশান্ত মৃধা ও কাজল কাননও আছে। সকাল ১১টা থেকে ১টা, মাঝে ২ঘন্টা বিরতি দিয়ে আবার ৩টা থেকে ৫টা। তারপর কবিতা পাঠের আসর ও সঙ্গীতসন্ধ্যা। ১টার বিরতিতে ভাবলাম, যে-ছেলেমেয়েরা বাড়ি যাচ্ছে, তারা আর ৩টায় ফিরবে না– ফিরবে সেই সন্ধ্যায়। কারণ দলছুটের সঞ্জীব চৌধুরী রাজবাড়ি এসেছে, এই খবর সারা শহর রাষ্ট্র হয়ে গেছে ততক্ষণে। সন্ধ্যায় তার দরাজ গলার গান। অতএব ৩টার জায়গায় আমি নিজেই সোয়া ৩টায় মিলায়তনে ঢুকলাম। ঢুকেই চোখ ছানাবড়া। আমার আগেই সবাই ফিরেছে। বাকি দুঘন্টাও বইয়ে-বইয়ে প্রশ্নে-উত্তরে পার হল। এরপর আলাদা ঘরে অতিথিদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা। ফিরে এসে দেখি, কবিতা বিষয়ক আলোচনা শোনার জন্যও বসে আছে ছেলেমেয়েরা। কবিতার জন্য এত ধৈর্যও আছে এই শহরের ছেলেমেয়েদের? আহলে যে ঢাকার প্রকাশকরা বলেন, কবিতার পাঠক নেই? আসল কথা : পাঠক ঠিকই আছেন, তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য সিদ্দিকুর রহমানের মতো একনিষ্ঠ মানুষেরই অভাব। থাকলেও তার পাশে দাঁড়ানোর মতো রাজিয়া বেগম আর মতিউর রহমানরা নেই। শেষ দুজন এই শহরের ডিসি ও এসপি। দুজনেই সংস্কৃতিমনা। মতিউর রহমানের তো চর্যার দোহা থেকে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ পর্যন্ত অনেকের কবিতাই মুখস্থ। তার বক্তৃতা শুনলে মনেই হবে না, তিনি পুলিশে চাকরি করেন, যে-পুলিশ শুধু ক্ষমতাবানদের প্রোটেকশন দেয়, জনতাকে পেটায়। অনুষ্ঠান শেষে তিনি বললেন, "*মুক্তি পাঠচক্রের* মতো সংগঠন যদি পাড়ায়-পাড়ায় থাকত, তাহলে আর সন্ত্রাস থাকত না দেশে। পুলিশেরও দরকার হত না। যার বুকে কবিতা আর গান আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-কখনও সন্ত্রাস করতে পারে না।"– মতিউরের এই কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডিও বলেছিলেন, ১৯৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর, এমহার্স্ট কলেজের এক সভায় দেওয়া ভাষণে– ক্ষমতা যখন মানুষকে ঔদ্ধত্যের দিকে নিয়ে যায়, তখন কবিতাই পারে তার সীমারেখা টেনে দিতে। ক্ষমতা যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন কবিতাই তাকে শুদ্ধ করে তুলতে জানে।"

কেনেডিও আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নেই, ক্ষমতাবানরাও এখন কবিতা পড়েন না। তার মানে এই নয়, কবিতার কদর ফুরিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। সঞ্জীব চৌধুরী সেটা আমার চেয়েও বেশি জানে। সুরের কবিতায় মাতিয়ে দেয় সে সারা রাজবাড়ি–

> তোমার বাড়ির রঙিন মেলায় দেখেছিলাম বায়োস্কোপ
> বায়োস্কোপের নেশায় আমায় ছাড়ে না.....

আমাকেও কবিতার নেশা, নদীর নেশা ছাড়ে না। এই দুই নেশায় আমি এক বিস্ময় ছেড়ে আরেক বিস্ময়ের দেশে ছুটে যাই। আর এভাবেই আমি একজীবনে অনেকজীবন বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত জাদুবাস্তবতা জীবনের আনাচে কানাচে

আমি তখন দৈনিক মুক্তকণ্ঠের সাহিত্য সাময়িকী *খোলা জানালা* সম্পাদনা করি। টোকন ঠাকুরের একটি গদ্যের কিছু অর্ধসত্য সৈয়দ শামসুল হকের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক কে জি মুস্তাফাকে ফোন করলেন। কে জি মুস্তাফা আমাকে ডেকে পাঠালেন তার ঘরে।

কী?

সৈয়দ হকের সম্পর্কে ঐ কথাগুলো ছাপানোর জন্য *খোলা জানালা*কে ক্ষমা চাইতে হবে।

কেন ক্ষমা চাইতে হবে? কথাগুলো কি মিথ্যে?

না মিথ্যে নয়, তবু ক্ষমা চাওয়ার পেছে কিছু একটা হলেও ছাপাতে হবে।

এ কেমন কথা, মিথ্যে নয়; তবু ক্ষমা চাইতে হবে? হবে; কারণ সৈয়দ হক সম্পাদকের বন্ধু। তো কী লিখেছিল টোকন আর কী ছাপিয়েছিলাম আমি যে ক্ষমা চাইতেই হবে? টোকন লিখেছিল এবং আমিও তা ছাপার যোগ্য মনে করেছিলাম– "অতএব, শামসুর রাহমানের জন্মদিনে ব্যানার ঝুলিয়ে যে অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠান করা হল জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে, সে-মঞ্চে বেশ জাঁকিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল সৈয়দ শামসুল হককেও। অথচ তার মুখোশধারী কার্যক্রম তো দিনে দিনে উন্মোচিতই হচ্ছে। '৬৬ সালে যখন পাকিস্তান শাসনের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার আন্দোলনের দাবিতে সোচ্চার পূর্ব বাঙলার আপামর মানুষ, তখন কী ঘটা করে নির্লজ্জের মতো আপনি, সৈয়দ শামসুল হক, ৬ দফার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে– মোনায়েম খানের হাত থেকে ১ দফা পুরস্কারও নিচ্ছেন।"

কিছু-কিছু মানুষ আছেন, অপ্রিয় অর্ধসত্যকে যারা ভয় পান এবং ভয় থেকেই যুদ্ধংদেহী হয়ে ওঠেন। সৈয়দ হক তাদের দলে পড়েন। সক্রেটিসকে যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, তারাও ছিল এইপ্রকার অর্ধসত্যভীত মানুষ। বিচারসভায় দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবানবন্দিতে এদের সম্পর্কেই সক্রেটিস বলেছিলেন– "কারণ তারা এই কথা স্বীকার করতে নারাজ যে, তাদের জ্ঞানের ভান ধরা পড়েছে। অথচ এটিই সত্য। তারা ধরা পড়েছেন। এদের সংখ্যা অনেক। এরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দ্রুতকর্মা। এরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হয়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছেন।"

মোনায়েম খানের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার কথা পাঠককে জানিয়ে দেওয়ার জন্য সৈয়দ হক যদি টোকন ঠাকুরকে সাধুবাদ জানাতেন, তাহলে তিনিও সাধুবাদ পেতেন পাঠকদের। কিন্তু সৈয়দ হক তার উল্টোটি (ক্ষুব্ধ হয়ে বন্ধু-সম্পাদকের কাছে অন্যায় আব্দার) করেন। ভুল কার না হয়? শামসুর রাহমানও আইয়ুব খানের হাত থেকে আদমজী পুরস্কার নিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে। মঈনুল আহসান সাবের যখন তার এক লেখায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল, শামসুর রাহমানেরও উচিত ছিল সাবেরকে সাধুবাদ জানানো। ভুল করতে-করতেই তো জীবনের পথ হাঁটে মানুষ। আবার এ-ও ঠিক, সেই ব্যর্থতার কথা ভুলে থাকতেই ভালবাসে সে। জীবনানন্দের সেই পঙ্‌ক্তিটির মতো– 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।'– তবে কেউ যদি সেই বেদনা জাগিয়েই দিয়ে যায়, তাকে বুকে টেনে নেওয়াই উত্তম। তাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি কম হয়।

যে-ভুলের জন্য শামসুর রাহমান ও সৈয়দ শামসুল হক পার পেয়ে যান, সেরকমই একটি ভুলের কারণে আহসান হাবীবকে মৃত্যুর পরও জবাবদিহিতা করতে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের কাগজে সই করেছিলেন আহসান হাবীব। কাজটা তিনি ভালো করেননি। কিন্তু তার অন্য সব ভালো এত বেশি, যে এই ভুলটিকে আমরা ক্ষমা করতেই পারি। সাতচল্লিশের ভারত-বিভাগের সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। শুধু মুসলমানের ছেলে বলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো কবিও তাকে আকাশবাণীর চাকরিটি দেননি– এই গল্প আমি আহসান হাবীবের মুখেই শুনেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার পেছনে এই ঘটনাটি তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তবে এর জন্য তাকে অনুতপ্ত হতেও দেখেছি। নাঈম সম্পাদিত *সময়ে* আমরা আহসান হাবীবের একটি সাক্ষাৎকার ছেপেছিলাম সেই সময়। তাতে তিনি বলেছিলেন– "সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐতিহ্যের নবায়নই আধুনিকতা।" আহসান হাবীবের মধ্যে নিজেকে নবায়নের সেই আধুনিকতা ছিল বলেই বিশ শতকের সাতের ও আটের দশকে আবির্ভূত অসংখ্য কবি-লেখকের তিনি প্রিয় 'হাবীব ভাই'।

আমিও ভুলে-ভরা চুয়াল্লিশ বছরের জীবন পাড়ি দিয়ে চলেছি। এক-দেড় বছর মেয়াদি একটি বড় ভুল আমি নিজেই স্বীকার করি অনুজদের কাছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন দেখে আমি একটি সরকারি প্রকল্পের পত্রিকায় কাজ করেছিলাম ঐ দেড় বছর। এরশাদ সরকারের আমলে। তা নিয়ে একসময় কথাও শুনতে হয়েছে। শুনে সংশোধিত হয়েছি– চাকরিটি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরশাদের রাজনীতি করিনি, তার ওপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে টাকা কামাইনি, তার কাছ থেকে প্লট উপহার নিইনি– তবু ঐ সামান্য একটা চাকরির জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। কোনও সরকারের কাছ থেকেই আমি কোনও ব্যক্তিগত সুবিধা নিইনি– পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে ঐ চাকরিটি করা ছাড়া। বিজ্ঞাপন ছাড়াও আমি তখন শেখ হাসিনাকে এরশাদের সঙ্গে একই সংসদে বসা থাকতে দেখেছি। আমার যদি ভুল হয়, এরশাদকে যারা শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন, এরশাদের সঙ্গে যারা সংসদে গেছেন, এরশাদ সরকারের আমলে যারা সরকারি চাকরি করেছেন, সবারই হয়েছে সেই ভুল। এরশাদ ছিলেন দেশি স্বৈরাচার। ইয়াহিয়া পরদেশি।– আবার গণহত্যাকারীও। পরন্তু সেইসময় মুক্তিযুদ্ধও চলছে। অতএব ইয়াহিয়া সরকারের অধীনে একাত্তরে যারা সরকারি চাকরি করেছেন, তাদেরটা আরও ভুল। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে অভিনন্দন, তিনি তার একাত্তরের সেই ভুল স্বীকার করে 'রচনা বইয়ের বিষয়বস্তু' শিরোনামে একটি গদ্য লিখেছিলেন *আজকের কাগজের কালের খণ্ডচিত্র* নামের যুগপূর্তি সংখ্যাটিতে। বিশেষ ঐ সংখ্যাটি আমিই সম্পাদনা করেছিলাম। কোন সরকারের আমলে কে কয়টা প্লট পেয়েছেন, ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন, সরকারি টাকায় বিদেশ সফর করেছেন তার হিসেব যদি আমাদের কবি-লেখকরা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো ঝকপটে জাতিকে জানাতেন, না-জানা অর্ধসত্যগুলোও সবার জানা হত। বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সুবিধা হাতিয়েছেন একালের প্রায় সব মহামানবই। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ থেকে শুরু করে অনেকেই। এত যে বোকাসোকা রফিক আজাদ, তিনিও সরকারি প্লট পেয়েছেন। মিডিয়ার বড় সাংবাদিকরাও বাদ যাননি। হবু দৈনিকের হবু সম্পাদক নাঈমের ভাগ্যে একসঙ্গে দু-দুটো প্লট লেগে গিয়েছিল। ক্ষমতার দরজায় ঘুরঘুর করা মানুষদের নিয়ে আমার একটি পঙ্‌ক্তি আছে– 'পাশে কিছু বুদ্ধিজীবী চাই যারা ক্ষমতার এঁটো পেলে খুশি।' সবাই নেয়– আমি একবার দিতেও গিয়েছিলাম ক্ষমতাকে। শেখ মুজিবকে ভালবেসে *৩২ নম্বর চোখের আলোয় দেখেছিলাম* নামে একটি বই বের করেছিলাম আমি আর আমার বন্ধু বজলুর রহমান বেগ। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে ও ব্যয়ে। সম্পাদক আমি; বজলু প্রকাশক। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আব্দুল কাদের চৌধুরীও যুক্ত ছিল সেই প্রকাশনার সঙ্গে। শেখ হাসিনা তখন প্রধানমন্ত্রী। শিশু-কিশোরদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত সেই বইয়ের প্রকাশনা উৎসবটি গণভবনে করার সুযোগ দিয়ে তিনি আমাদের সত্যিই অবাক করেছিলেন। হাসিনা তখনও আগের হাসিনাই আছেন। শিশুদের ভিড়ে শিশুর মতোই উচ্ছলতায় কাটিয়েছিলেন তিনি একটি বিকেল। শামসুর রাহমানও ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। সেই শেষ। ক্ষমতার পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে আমি আর বিরক্ত করতে যাইনি। কারণ, সেখানে গেলে মুনতাসীর মামুনের মতো অগ্রজদের সঙ্গে দ্যাখা হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল, পাঁচ বছরের অনুজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি-লেখকদের সঙ্গেও যারা পাঁচশ বছরের ঐতিহাসিক দূরত্ব নিয়ে মেশেন। আর জনগণের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তো হাজার বছরেরও বেশি। এরাই শেখ হাসিনাকে জনবিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন ক্ষমতার পাঁচ বছর।

হিটলারের পক্ষে কথা বলার জন্য এজরা পাউণ্ডকেও কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের জন্য আজও কবিতার ইতিহাস তাকে স্মরণ করে। তাহলে কেন আমরা আমাদের জীবনের ভুল-চুকসহ সব অর্ধসত্যকেই স্বীকার করে নিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *এই জীবনের মধুর যত ভুলগুলির* মতো সাহসী লেখা লিখতে পারি না? কেন হাজার বছর আগের জেন কবির মতো নরককেই চুমু খেতে পারি না?–

ছিষট্টি বছর
পাপ জড়ো করে-করে,
জীবন আর মৃত্যুকে ছাড়িয়ে
নরককে চুমু খেলাম।

নরককে চুমু খাওয়ার এই সাহস তসলিমার আছে। সে-জন্যও আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি তাকে। যদিও ক-এ যুক্তিগ্রাহ্যতার চেয়ে বিদ্বেষই বেশি, তবু বইটি আমাদের প্রচল সংস্কারের ভিতে একটা ধাক্কা দিতে পেরেছে। যুগ-যুগ ধরে নারীর ওপর যে-নির্যাতন চলে আসছে, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন নারী যদি কিছুটা আক্রোশপ্রবণও হয়, সেই আক্রোশকে মেনে নেওয়ার মতো উদারতা সবার মধ্যেই থাকা উচিত। কিন্তু যে-কাজটি তসলিমা ভালো করেনি– বিদ্বেষজনিত বা নিছক খেয়ালিপনায় সে কিছু নারীকেও সমাজে ছোট করেছে। এমনকী নিজের একদা বান্ধবীদেরও রেহাই দেয়নি। নারী হয়েও তসলিমা ঐ নারীদের রেপ করেছে। মিডিয়ার হইচই তসলিমার ক-এ আক্রান্ত নারীদের দ্বিতীয় দফা রেপ করেছে।

অ্যাটেম্‌ট টু রেপ-এর একটি ঘটনায় টোকন ঠাকুরকে একবার শাহবাগ আজিজ মার্কেট ছাড়তে হয়েছিল। উত্তরায় থাকে, গল্প লেখে, ছোটকাগজ সম্পাদনা করে একটি মেয়েকে টোকন রেপ করতে চেয়েছিল, এই খবর প্রথম শুনি বয়েত-অণুগল্প-রূপকথার লেখক সেলিনা শিরীন শিকদারের মুখে। শিরীনের রূপকথা ভার্জিনিয়ার স্কুলগুলোয় পাঠ্য। *ব্যাগাজিন* নামে ছোটদের একটি পত্রিকার সম্পাদক শিরীন। ওর বাবা আবু জায়েদ শিকদার একজন ভাষাসৈনিক। ভাষা আন্দোলনের কারণে গ্রেফতারকৃত প্রথম ১০জনেরও একজন। কিন্তু এই বিষয়টিকে পুঁজি করে তিনি কোনও বাড়তি সুযোগ নেননি জীবনে। শিরীনের মধ্যেও বাবার এই গুণটি আছে। তাই ওর মুখ থেকে শোনা খবরটাকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। তারপর শাহবাগ আজিজ মার্কেটে গেলে অনেকেই একই তথ্য দেয়। একদিন সেই আক্রান্ত মেয়েটিও। নারী+পুরুষের মধ্যে যৌনসম্পর্ক অনেক সমাজেই স্বীকৃত। কিন্তু তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনেরই সমর্থন থাকা চাই। নইলে স্বামীও যদি স্ত্রীর অনিচ্ছায় সহবাস করে, তা ধর্ষণেরই সামিল। যৌনবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে ধর্ষকাম বলে। মোনায়েম খানের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য এত-এত সাহিত্যকর্ম থাকার পরও সৈয়দ শামসুল হককে যদি এতদিন পর জবাবদিহি করতে হয়, তবে টোকন ঠাকুরকে নয় কেন? অর্ধসত্য যখন নিজেকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে, তখন কেন টোকন চোরের মতো পালিয়ে বেড়ায়? একজন অভিযোগ করলেই কেউ রেপিস্ট হয়ে যায় না। (বাজারে অনেক কলগার্লও আছে, পুরুষদের ব্ল্যাকমেইল করে যারা বৈষয়িক ফায়দা লোটে।) কিন্তু সত্যের বাকি অর্ধেক নিয়ে কেউ যখন পালিয়ে বেড়ায়, তখনই মানুষ সন্দেহ করে। শুনতে পাই, পালিয়ে থাকতে চেয়েও পরিত্রাণ পায়নি টোকন ঠাকুর। তার মহিলা সংস্থা নাকি মহিলা পরিষদের চাকরিটি সে এই কারণেই খুইয়েছে। লোকনিন্দার ভয় ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানের বেশি। 'ধর্ষণচেষ্টা'র অভিযোগে স্বয়ং 'চেষ্টাকারী'ই যেখানে পালিয়ে বেড়ায়, কোনও প্রতিষ্ঠান নেই, সেই দায় কাঁধে তুলে নেয়।

আরও শুনতে পাই, আক্রান্ত মেয়েটি টোকনের বিরুদ্ধে মামলাও করতে চেয়েছিল; বন্ধুরা তাকে নিবৃত্ত করেছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে এ-জাতীয় অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রয়েছে ধর্ষক ও তার সহযোগীদের জন্য। টোকন ঠাকুর এত বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে? ভাবতে ইচ্ছে করে না আমার। কারণ সে ভালো কবিতাও লেখে। কিন্তু আক্রান্ত মেয়েটিও তো ভালো গল্প লেখে। তার দেওয়া অর্ধসত্যের বাকি অর্ধেকটার খবর আমি রাখি না– রাখে টোকন ঠাকুর। ফলে আমাকে নীরব-শ্রোতা হয়েই থাকতে হয়।

AMARBOI.COM

কিন্তু কেউ যখন টোকনের কবিতাকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে বসে, তখনও যদি আমি নীরব থাকি, সেটা অপরাধেরই সামিল। টোকন যে ভালো কবিতাও লেখে, সেই অর্ধসত্য আমার কাছে আছে। সমসাময়িক ও নিকট অগ্রজদের অনেককেই সে উচ্চতায় ছাড়িয়ে এসেছে। রহমান হেনরীর ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। বড়কাগজের বামন-সম্পাদকরা রহমান হেনরী আর টোকন ঠাকুরের উচ্চতায় আতঙ্কিত হয়ে তাদের দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র শুরু করে। একসময় টোকনের কবিতায় জয় গোস্বামীর ছায়া ছিল। আমার নিজের কবিতার ছায়াও লক্ষ করেছি তার কবিতায়। সেটা প্রথম দিককার কথা। সব কবিই অগ্রজের ছায়াভূমে বড় হয়। আমিও হয়েছি। কিন্তু যখন টোকন নিজের কাব্যভাষা নিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে, তখনই মাসুদুজ্জামান তাকে প্রাক্তন অভিযোগে খারিজ করে-দেওয়া একটি গদ্য লেখেন। এইসব উদ্দেশ্যমূলক গদ্যের সবচেয়ে বড় বিপণনকারী *প্রথম আলো সাময়িকী*। সেখানেই ছাপা হয় মাসুদুজ্জামানের গদ্যটি। সুযোগ পেলে টোকনও অন্যের সম্পর্কে কুৎসা রটায়, আমি জানি। কিন্তু সবার *প্রথম আলো* বা টোকন ঠাকুর হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে না। অতএব *অমিত্রাক্ষরে* প্রকাশিত আমার 'কবিতার বাঁক অথবা বাংলা কবিতার ৫০ বছর' শীর্ষক প্রচ্ছদ-প্রবন্ধে আমি রহমান হেনরী ও টোকন ঠাকুরের বিরুদ্ধে মিডিয়ার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে লিখি– "এই দুই কবি কৃত্যের বিভায় সমসাময়িক ও নিকটঅগ্রজদের অনেককেই ছাড়িয়ে এসেছেন বলে নিচ থেকে এদের টেনে ধরার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। (বামনের দেশে উচ্চতাই যোগ্যের একমাত্র অপরাধ)।"

আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে টোকন ঠাকুর আমার বাসায় ছুটে এসে বলে, "প্রথম আলোর বজ্জাত শরীফ (সাজ্জাদ শরীফ) মাসুদুজ্জামানকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লেখানোর পর আমি এতই শক্‌ড হয়েছিলাম যে, ভেবেছিলাম, কবিতা লেখাই ছেড়ে দেব। আপনি আমাকে পাহাড়সমান প্রোটেকশন দিয়েছেন।"

সেই আড্ডায় রনজু রাইম এবং সাইকেলে ৪৪টি দেশ পর্যটনকারী আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বলও ছিল। যে-টোকন আড়ালে সাজ্জাত শরিফকে 'বজ্জাত শরিফ' বলতে পারে, পেছনে যে সে আমারও বদনাম গেয়ে বেড়ায়, সেকথা বুঝতে শেখার বয়স আমার আগেই হয়েছে। তবু আমার বুঝ নবায়ন করে নিজেই আমি নতুন করে বুঝতে থাকি টোকনকে। টোকন তখন *প্রথম আলোয়* তার চাকরি না-হওয়ার গল্প বলতে শুরু করেছে। কাওরান বাজারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে *প্রথম আলোর* কোনও একজন সিনিয়র সাংবাদিক তাকে চাকরির আশ্বাস দিলেও সাজ্জাদ শরিফ প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "টোকন কবি, চাকরি না-করলেই ও ভালো কবিতা লিখবে"– এইসব অর্ধসত্যে আড্ডার বাতাস যখন ভারি হয়ে উঠেছে, আমি তখন টোকনকে শুনিয়ে উজ্জ্বল আর রনজুকে বলি– "টোকন নিজের মুখে বলেছে, ওকে আমি পাহাড়সমান প্রোটেকশন দিয়েছি। এবং তোমরাও দেখে নিও, এর বিনিময়ে টোকন খুব শিগগিরই ওর প্রোটেকটরকেই অ্যাটাক করে বসবে।"

আমার কথায় রনজু আর উজ্জ্বল একসঙ্গে হেসে উঠলে টোকন অপ্রস্তুত হয়ে বলে– "শাহরিয়ার ভাই, আপনাকে আমি কত বড়... কত বড়...কবি জানি, সেটা খুব শিগগিরই জানবেন আমার লেখায়।"

আর আমি শুনতে পাই, টোকন বলছে– "শাহরিয়ার ভাই, আপনাকে আমি কত বড়...কত বড়... শিক্ষা দেব, সেটা খুব শিগগিরই টের পাবেন আমার কাজে।"

দুটোই অর্ধসত্য। টোকন যেটা বলেছে এবং আমি যেটা শুনতে পেয়েছি। দুটো যোগ করলে একটা ছায়া-ছায়া সত্যকে পাওয়া যায়। এবং মানুষের সব সম্পর্কই ছায়ামাত্র– তাকে বুকে ধরে রাখে শুধু বোকারাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে-হাতে টুথব্রাশ, আমি খুঁজি নিমের দাঁতন

আমার অর্ধসত্যের দর্শন ইতিমধ্যেই বন্ধুমহলে প্রচার পেয়ে গেছে। সাইবার-প্রভাবে দেশের বাইরেও অনেকে জেনে গেছে এর খবর। ইমেলে-ইমেলে তার বার্তা আমার কাছেও ঘুরে আসছে। তসলিমা হলে আমি হয়তো বলেই বসতাম, "সারা পৃথিবী জুড়ে আমার এই দর্শন নিয়ে হইচই পড়ে গেছে।" ক পড়ে মনে হতে পারে, তসলিমা যখন যে-দেশে যায়, সেদেশের সবাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে তসলিমাকে নিয়েই মেতে থাকে দিনরাত্রি। না, তসলিমার এই কথা সিকিসত্যও নয়। আগেই বলেছি, পৃথিবী জুড়ে এখন চলছে demassification-এর যুগ। ইরাক যুদ্ধেই সিএনএন-বিবিসির একচ্ছত্র খেল খতম। কুশ-ব্লেয়ার-সাদ্দামের চেয়েও ঐসময় বড় হিরো সায়ীদ আল সাহাফ। সাদ্দামের তথ্যমন্ত্রী। বাগদাদের পতন হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত পৃথিবীজোড়া মানুষকে মাতিয়ে রেখেছিলেন তিনি তার প্রেস-কনফারেন্স দিয়ে। আজকের কাগজের আনিস আলমগীরের তখন কয়েক শ তসলিমার সমান খ্যাতি বাংলাদেশে। যুদ্ধ শেষ, সাহাফ আর আনিস আলমগীরের সেই খ্যাতিও শেষ। সব নামই স্লেটে-লেখা। সবাই আমরা মুছে যেতেই আসি। তবু তসলিমার মতো কেউ-কেউ নাম লেখার জন্য অনপনেয় কালি খুঁজে বেড়ায়। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, চায়। কিন্তু এই চটজলদি সাইবার যুগে মানুষের এত সময় কোথায় এক তসলিমাকে নিয়ে পড়ে থাকার। ব্যক্তিগত জীবনের অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই তার কাছে অনেক বড়। ঐ তো সামান্য একটা শরীর মানুষের; নারী-পুরুষ ভেদে যৎসামান্য অঙ্গভেদ। কতক্ষণ আর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে পাঠক? পুরুষভেদে সেই শরীরের যত ভেদকথা, অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার উজাড় করে তসলিমা সবই জানিয়েছে পাঠককে। একই কথা বলেছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। বার-বার মনে করিয়ে দিয়েছে ভারতচন্দ্রের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিকে— 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর'। যে পাসপোর্ট-ভিসা-সমস্যা নিয়ে সাতকাহন লিখেও তসলিমা তার আসল কথাটি গুছিয়ে বলতে পারেনি, সেই কথাই সালমান রুশদি কত চমৎকার লিখে রেখে গেছেন তার 'Without Let or Hindrance' শিরোনামের সংক্ষিপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনাটিতে। অনূর্ধ ৪০০ শব্দে লেখা। *পেন কানাডা* থেকে প্রকাশিত কবি-লেখকদের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা সম্বলিত *Writing Away* নামের সংকলনে প্রকাশিত। সালমান রুশদির বিদেশভ্রমণের ওপর তসলিমার চেয়েও বেশি নিষেধাজ্ঞা। যতক্ষণ না বন্দিত্ব কাটে, অন্যের লেখায় ভ্রমণ করে অন্য লেখককে পাঠে-পাঠে ঈর্ষা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন রুশদি। সে ইচ্ছেরই প্রতিফলন ঘটেছে তার ভ্রমণ বিষয়ক রচনাটিতে। এই সংকলনে রুশদি ছাড়াও আরও তেত্রিশজন লেখকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা সূচিবদ্ধ হয়েছে। বইটির প্রকাশসাল– ১৯৯৪। পড়লে মনে হয়, সদ্যপ্রকাশিত একটি বই। আজই বাঁধাইখানা থেকে এসেছে। ভালো বই যে কখনও পুরানো হয় না, কন্সটেন্স রুটস সম্পাদিত *Writing Away*-ই তার প্রমাণ।

পৃথিবীর ৪৪টি দেশের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থাকার পরও *পেন কানাডার* ভ্রমণ বিষয়ক বইটির নাম শুনেই আমার বাসায় ছুটে আসে উজ্জ্বল। সম্প্রতি ওর নিজেরও একটি বই বেরিয়েছে *সঙ্গী সাইকেল ও আরাধ্য* পৃথিবী নামে। *খোলা জানালা* দিয়েই উজ্জ্বলের লেখালেখির শুরু। সেকথা উজ্জ্বল ওর ভূমিকায় খুব বড়গলায় বলেছে। এতে অনেক বামন-সম্পাদকই যে অসন্তুষ্ট হয়ে (যেহেতু আমি 'বামন' বলি তাদের) বইটির পরিচিতি পর্যন্ত ছাপাবে না তাদের পাতায়– উজ্জ্বল সেকথা জানে। কিন্তু বইয়ের মতো বই হলে ঐসব রিভিউ-পরিচিতি লাগে না। গোটা পৃথিবীই উজ্জ্বলের পাঠ্য। মিডিয়ার বামনদের সে আমার চেয়েও ভালো চেনে। বইটির একবছরেই সংস্করণ শেষ। আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আবু দারদা যোবায়ের। যোবায়ের তখন *মুক্তকণ্ঠের* রিপোর্টার। এখন *এটিএন*-এর এসোসিয়েট প্রোডিউসার, নিউজ। সাংবাদিকতার ওপর একটা ফেলোশিপ নিয়ে কম্বোডিয়ায় আছে। আমাকে অ্যাঙ্করভাট দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে যোবায়ের। *Writing Away* হাতে নিয়ে *আমি* আর উজ্জ্বল একসঙ্গে সেদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটি। এই বই কখনো পুরানো না-হওয়ার মতো একটি বই।

অথচ পড়ামাত্রই বাসি হয়ে যায় *তসলিমা নাসরিন ক*। নাসরিনের বইটিকে রদ্দি কাগজের ভিড়ে চালান করে দিয়ে হাতে তুলে নিই রামকিঙ্কর বেইজের *মহাশয় আমি চাক্ষিক, রূপকারমাত্র*। একাধিকবার পড়েছি বইটি। তবু বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। কম শব্দে কত বেশি কথা বলা যায়– তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বই। সৃষ্টির জন্য নির্জনতার কোনও বিকল্প নেই, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও। রামকিঙ্করের ভাষায়– "আজকাল খালি কথার প্রচার এবং প্রচার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কানেও ঢুকছে না। কারণ গোলমাল আর গোলমাল। মেশিনের গোলমাল এ যুগের একটি প্রধান গোলমাল। আর কী চাই। এতই যদি মেশিনের যুগ, এবার 'সাইলেন্সের যুগ' কবে আসবে তারই আশায় রইলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইলেন্সের সেই যুগ আসেনি। উল্টো মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিডিয়া। অতএব গোলমাল আরও বেড়েছে। বাড়ুক। নির্জনতা রচনা করে নেওয়ার মতো মানুষেরও অভাব নেই পৃথিবীতে। স্বরচিত নির্জনতায় বসে রামকিঙ্করের বইটি নতুন করে পড়তে থাকি–

> হ্যাঁ এসেছে। জীবনে অনেক নারীই এসেছে। কেউ এসেছে দেহ নিয়ে, কেউ এসেছে মানসিক তীব্র আকর্ষণ নিয়ে।....
>
> দেহের সংয়োগও ঘটেছে। তবে হ্যাঁ, আমি বাপু দায়িত্বের ভেতরে যাইনি। ...কিন্তু এই দৈহিক তৃপ্তিটুকু সব নয়, বুঝলে, তা থেকে জন্ম নিয়েছে আমার অনেক ছবি, মূর্তি আর কল্পনা আর অনুভব। দু'একজন নারী এসেছে আমার কাছে মানসিক আকর্ষণ নিয়ে। তীব্র সে আকর্ষণ। অনেকে ভুল বুঝেছে। তা বুঝুক গে। কিন্তু তারা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে।
>
> একটি ঘটনা বলি শোনো। খুব গোপনীয় ব্যাপার। তখন আমি গুরুদেবের রিয়েলিস্টিক পোট্রেটটা করছি। হঠাৎ তিনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও আছে কি না– অর্থাৎ আশেপাশে কোনও ভক্ত বা অনুচর আছে কি না। দেখে নিয়ে চুপিচুপি বললেন– 'দেখ্, যখন যা পাবি, দেখবি– একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরবি– তারপর তাকে নিংড়ে, চিবড়ে করে হজম করে ছেড়ে দিবি।' সাংঘাতিক কথা। এ কথার অর্থ বোঝো? আজও কথাটা আমার মধ্যে মন্ত্রের মতো কাজ করে।
>
> হ্যাঁ, আর-একটা ব্যাপার হচ্ছে, ছবির কথা বা কোন মূর্তির ব্যাপার মাথায় একবার এসে গেলে তখন আর সঙ্গম-টঙ্গমের কথা মনেই থাকে না।

যা বলার খোলাখুলিই বলতেন রামকিঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের মতো চুপি চুপি নয়। তবে মাথায় একবার ছবির কথা মূর্তির কথা এসে গেলে 'সঙ্গম-টঙ্গমে'র কথা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতেন মন থেকে। খোলাখুলি কথা বলার সেই রামকিঙ্করীয় সাহস শতকরা নিরানব্বই ভাগ বাঙালিরই নেই। শামসুর রাহমান এবারও বলতে পারতেন, "তসলিমার কলমের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" সৈয়দ শামসুল হক তসলিমার বই নিয়ে মামলা না-করে কলমে জবাব দিলেই লেখকসুলভ আচরণ হত। অস্বীকার করব না, তসলিমা সঙ্গে একসময় আমার সুসম্পর্ক ছিল। তার মানে এই নয়, তাকে আমি শয্যায় পেতে চেয়েছিলাম। বরং সেই ইচ্ছে তসলিমারই ছিল। আমি সাড়া দিইনি। তবে কবিতার জন্য, আমার মতো, সে-ও কাটিয়েছে অনেক নিদ্রাহীন রাত। কিন্তু দেহের কথা বা সঙ্গমের কথা মনে হলে কবিতার কথা তার মনেই থাকে না। ভুলে যায়– ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপক নয়, একদিন সে কবি হতে চেয়েছিল।

সামান্য এক শরীর। তা নিয়েই তসলিমার কত কী সাতকাহন। তা পড়েই কত কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইচই, কত কী মামলা-মোকদ্দমা। যত না মানুষের শরীর, তার চেয়েও নগণ্য এক প্রকরণে বাধা মানুষের সামাজিক জীবন। 'বিবাহ' সেই প্রকরণের নাম। সাধ থাকলেও সেই প্রকরণে কুলোয় না বলে একদিন তসলিমা তার চিঠিতে লিখেছিল– "সাধ্য থাকলে সব শুরু থেকে শুরু করতাম আবার।"– সেই শুরুতেই সে ফিরেছে। আবার এসে দাঁড়িয়েছে তার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন হাতে। রুদ্রর ঢাকার ঠিকানা থেকে তসলিমার ময়মনসিংহের ঠিকানায় একসময় ঝাঁক-ঝাঁক চিঠি ডানা মেলে উড়ে যেত। সেইসব চিঠির উত্তর আকাশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে বলে গান লিখেছিল রুদ্র। কিন্তু আকাশের ঠিকানায় না-পাঠিয়ে আমার *গতি*র ঠিকানায় উত্তর পাঠিয়েছিল তসলিমা। রুদ্র আজ নেই। যারা আছি, তারাও থাকব না একদিন। কেউ কারও হব কিংবা হব না। কেউ কাউকে পাব কিংবা পাব না। কথা তো সেই দুটির একটি। দুটিই অর্ধসত্য। তসলিমারটাও, আমারটাও। আমার কবিতাতেও সেই অর্ধসত্যের কথা আছে। কবিতাটি না-হয় তসলিমার সাহসকেই উৎসর্গ করলাম এতদিন পর–

কথা তো সেই দুটির একটি : আছো বা নেই
একলা জীবন কাটিয়ে দিলাম পাগলামিতেই

নোটকুড়ানি হলেই বোধহয় বর্তে যেতাম
আমার মনের পাগল ছেলে অঙ্কে কাঁচা
প্রত্যহ সে বিদঘুটে সব প্রলাপ বকে
পাগলামি তার তুঙ্গে ওঠে মধ্যরাতেই

এখন তোমার স্তনের নিচে বালিশ গোঁজা
তার মানে তো হিসেব সোজা : স্বপ্নে আছো
এই আষাঢ়েই স্বপ্নে কিছু গাছ লাগাব
ফুল ফোটাব স্নানঘরে কেউ ঢোকার আগেই

কথা তো সেই দুটির একটি : আছো বা নেই
একলা জীবন কাটিয়ে দিলাম পাগলামিতেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশকে যুবতী হয় কিশোরীরা, কবি একা প্রাচীন কিশোর

তার মানে এই নয়, আমার জীবনে কোনও নারীই আসেনি। সেই কবে ঢাকার লেক সার্কাস স্কুলে ক্লাস টুয়ের একটি মেয়ে আমার খাতায় একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল। আমি তখন ক্লাস ওয়ান। টিফিন আওয়ার– মাঠের সবুজে উবু হয়ে ছবি আঁকছে এক ক্লাস টু। নাকি সে-ও ওয়ান? ঐ স্কুলের সব স্মৃতি ছাপিয়ে এই একটাই দৃশ্য আমার মনে আজও ঘোরাঘুরি করে। অনেক চেষ্টা করেছি সেই দৃশ্যটাকে কবিতায় ধরতে– পারিনি। এই দৃশ্যই আমার জীবনের প্রথম প্রেমের দৃশ্য। কী নাম ছিল সেই ক্লাস টুয়ের? কেন সে ক্লাস ওয়ানের খাতায় ছবি এঁকে দিচ্ছিল– সবই আজ স্লেটে লেখা নামের মতো বিস্মরণে তলিয়ে গেছে। তবু সেই মুখ অনপনেয়। তারপর আরও কত মুখ– সুলতানার মুখ, নাহিদের মুখ, রোনাকের মুখ...রেজিনার মুখ...আয়েশার মুখ... অতসীর মুখ... মেরিনার মুখ.....। সবার মুখে আমি সেই ক্লাস টুকেই খুঁজেছি। যখনই কোনও নতুন মুখ আমাকে আকর্ষণ করেছে, আমি সেই ক্লাস টুকে নিয়েই কবিতা লিখেছি। একবারই শুধু ক্লাস টুয়ের মুখটিকে আমি ধরতে পেরেছিলাম কবিতায়। ধরতে না ধরতেই ফের হারিয়ে গেছে। অন্য কারও মুখ এসে উঁকি দিয়েছে শূন্য পঙ্‌ক্তির শূন্য জানালায়। পরের মুখটিকেও আমি ধরতে পারিনি। তারপর আরও কত মুখ উঁকি দিয়ে গেছে। হয়তো কোনও বাসের জানালা দিয়ে দেখেছি তাকে কোনও দূর জীবনের পাড়ে। কিংবা দেখেছি কোনও অচেনা স্টেশনে, ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে। কিংবা শ্যালো নৌকায় পাড়াতলী বা কোঠাবাড়ি বা ডুবিগাঁওয়ে যাওয়ার পথে কোনও চর্যার দেশে। ধরতে পারিনি আমি কোনও মুখকেই আমার কবিতায়। তবু চেষ্টা করেছি অক্ষম কলমে–

সন-তারিখের হিসেব ছাড়াই
ইতিহাসের প্রান্তে দাঁড়াই
লুপ্ত কোনও ক্যালেন্ডারে
গুপ্ত কোনও শুক্রবারে
কার যেন মুখ... কার যেন মুখ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন গেছে দূর বিস্মরণে
ধোঁয়ায় ঢাকা চিরন্তনে
সব বুঝি আজ প্রাচীনপন্থী
যা দেখি তাই কিংবদন্তী
কার যেন মুখ... কার যেন মুখ...

শ্বেতকরোটি হাঁ-মুখ খুলি
প্রেমের গাছে ফোটায় বুলি
মুখ উঁকি দেয় মুখের আড়ে
নতুন কোনও শুক্রবারে
কার যেন মুখ... কার যেন মুখ...

জয় গোস্বামীর ভালো লেগেছিল এই কবিতাটি। খুব যত্ন করে ছেপেছিল *দেশ* পত্রিকায়, যখন আমি সে-পত্রিকায় লিখি।

কেই বা আমি, আর কারই বা মুখ আঁকতে চাই কবিতায়? রেজিনার কথা আমার কবিতায় এসেছে; কিন্তু তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে জলিদের ছাদ। কুমিল্লা রেসকোর্সের জলি। রোজ বিকেলে বাড়ির ছাদে পায়চারি করত। আমার বাবা কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে এলে ফখরুল হুদা হেলাল, মমীন শাহগীর, আবুল হাসনাত বাবুল, হানিফ সংকেত, মাসুক হেলাল, জাকির হোসেন বাবু, মহিউদ্দিন আহমেদ আর নীতিশ সাহাকে লেখালেখির বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম। স্কুলের বন্ধু ছিল তাহের, এনাম, মোর্শেদ, বাকের, শামীম, নাঈম, আজফার, তারিক, খুরশীদ, কিশোর, দুলাল, ধীমান, এনায়েত, সোবহান, জামিলসহ আরও অনেকেই। ছেলেবেলার কথা মনে করার সময় এখন আর কারও ঘড়িতেই নেই। দুলার বহু আগেই জাপানে স্থায়ী হয়েছে। বাকের আর তারিক সেনাবাহিনীর ধোপদুরস্ত জীবনে। শামীমের অনেক টাকা হয়েছে; বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় গ্রুপ অব কোম্পানিজগুলোর একটি তার ল্যাবএইড গ্রুপ; দেশের প্রেসিডেন্ট কদিন আগেও তার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। আশি লাখ টাকা দিয়ে মার্সিডিজ কিনলেও শামীম তার ছেলেবেলার বন্ধু আলমগীরের তিনদিনের বেতন কাটে। অথচ শামীমের উত্থানের পেছনে এই আলমগীরের অনেক অবদান। আলমগীর যখন বামরুনগ্রাড হসপিটালের কান্ট্রি ম্যানেজার হয়ে এই গল্পটি আমাকে শুনিয়ে গেল, শামীমকে আমার এই শহরের সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষ বলে মনে হয়েছিল। কী হবে ঐ যন্ত্রের মার্সিডিজ দিয়ে যদি বন্ধুর মনই সে বুঝতে না-পারে? আমাকেও চড়াতে চেয়েছিল সেই মার্সিডিজ। আমি ওকে ওর ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে মীরপুর রোডের কার্ডিয়াক হসপিটাল পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। যেন ১৯৭৫ সাল। স্কুল ছুটির পর দুই বন্ধু হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ফিরছি। সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে এসে কী মনে করে শামীম বিনয় মজুমদারের 'মন্দিরেও আবর্জনা জমে' কবিতাটা শুনতে চাইল আমার কাছে। কবিতাটা আগেও শুনিয়েছি ওকে। আবারও শুনালম তার দুই পঙ্‌ক্তি—

মন্দিরেও আবর্জনা জমে বহু প্রতিদিন দেখি
সেই সব আবর্জনা আমার হৃদয় থেকে ঝাঁট দিয়ে বার করি আমি।

কিন্তু আমি জানি, এত আবর্জনা জমেছে শামীমের হৃদয়ে যে, একদিনে তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার নয়।

শামীমের সঙ্গে না-জমা আড্ডা এনাম, মোর্শেদ আর খুরশীদের সঙ্গে জমে। এনাম, মোর্শেদ আর খুরশীদও বড় ডাক্তার হয়েছে। কুমিল্লা শহরে বড় হাসপাতাল করেছে তারাও। সবাই খুব ব্যস্ত। গাড়ি-গাড়ি ব্যস্ততায় দিনমান শুধু ছুটোছুটি। সেই ছুটোছুটির মধ্যে খুরশীদই কেবল রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার* বইটি গাড়িতে রাখে। পঁচিশ বছর আগে কেনা বই এখনও হাতছাড়া করেনি সে। তাই কুমিল্লার ধর্মসাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে শুধু খুরশীদের সঙ্গেই নিজেকে মেলাতে পারি। টাকার নেশা ওকে মনের বৈভব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। অনেকদিন পর দুই বন্ধুর মধ্যে জলিদের বাড়ির ছাদ নিয়ে কথা হয় সেদিন। এনাম, এনায়েত আর আমির মিলে আমাকে জলিদের বাড়ির ছাদ দ্যাখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেই কবে। কখন সেই ছাদের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের মতো একটা মুখের দ্যাখা পাব, দূরে দাঁড়িয়ে সেই প্রতীক্ষাই করেছিলাম কোনও এক বিগত অপরাহ্নে। চেম্বারে রোগীরা অপেক্ষা করছিল খুরশীদের জন্য। ওকে বিদায় জানিয়ে একাই আমি জলিদের বাড়িটাকে হারিকেন দিয়ে খুঁজেছি। পাইনি। উঁচু-উঁচু অট্টালিকার ভিড়ে সেই শাদাবাড়িটা হারিয়ে গেছে তার আকাশসমান ছাদটিকে নিয়ে। সঙ্গে নিয়ে গেছে আমাদের আশ্চর্য সেই ছেলেবেলাগুলোকেও। ঢাকায় ফিরে একটা কবিতা লিখেছিলাম; 'শাদাবাড়ি পাড়ার আকাশ' নাম দিয়েছিলাম তার। রেজিনার মুখ আর জলিদের ছাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেই কবিতায়—

পাড়ার আকাশ ছিল রেজিনাদের ছাদ
আকাশে পূর্ণিমা ছিল একখানা চাঁদপানা মুখ
সে-মুখের দ্যাখা না-পাওয়াই ছিল আমাদের বিকেলের অমাবস্যা।
আমরা মানে চক্ষুসওয়ার যত হতচ্ছাড়া বালকের দল
শাদা বাড়িটার ছিল লালপেড়ে পাতাবাহার শাড়ি
আমরা ধুলোর ছেলে, দূরের রাস্তায় ছিল বিকেলের দৌড়
ছাদের পূর্ণিমা ছিল আমাদের সামষ্টিক প্রেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও পাড়াটা আছে, ঘরে-ঘরে মানব-বসতি
অথচ বাড়িটা নেই; শাদাবাড়ি, লালপেড়ে পাতাবাহার শাড়ি
দূরের রাস্তাটা খুব কাছ দিয়ে হেঁটে চলে গেছে
দুই পাশে হাউজিঙের সারি-সারি উঁচু অট্টালিকা
কেবল রেজিনা নেই, ছাদে আর পূর্ণিমা ফোটে না।

আমার অন্য একটি কবিতায় দুটি পঙ্‌ক্তি আছে– "তোমাকে আমি সর্বদেহে লিখি/ সর্বমনে তোমাকে করি পাঠ।"– সেই ভালবাসার কাছে না ধর্ম আমাকে যেতে দেয়, না সমাজ। 'বিবাহ' নামের একটি ঘুণেধরা প্রকরণ এসে চোখ রাঙায়। কিন্তু আমি কি এক অদৃশ্যকেও ভালবাসি না? সেই কবে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন– 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।' এখন সেই মুখ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে ঢাকা-পড়ার যুগ এসেছে। তাই সামনে ছবি নিয়ে বসলেও আমি নাসরিনের মুখ মনে করতে পারি না। অথচ কখনও না-দ্যাখা মুখ নিয়েও আমি কবিতা লিখেছি কত। লালমাটির দেশ মেদিনিপুর থেকে একটি মেয়ে আমাকে চিঠি লেখে নিয়মিত। তার সঙ্গে আমার দ্যাখা হয়নি কখনও। একবারই মঞ্জুষ দাশগুপ্তর সঙ্গে মেদিনিপুর গিয়েছিলাম। বিপ্লব মাজীর কবিতা উৎসবে। সঙ্গে ছিল আনিস রহমান। মেদিনিপুরের সেই উৎসবে মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। শ্রোতাদের মধ্যে বসে থেকে সে আমার কবিতা শুনেছিল। তারপর উদ্যোক্তাদের কারও কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখেছিল একমাসের মধ্যে। সেই যোগাযোগ এখনও আছে। পাবনার একটি মেয়েও আমাকে কবিতার ভাষায় চিঠি লেখে। তাকেও কখনও দেখিনি। সেও দেখেনি আমাকে। বর্ষায় যখন পদ্মায় পানির অভাব নেই, তখন পাবনা শহর থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ নৌকায় মাত্র আধঘণ্টার মামলা। অতএব প্রতিবর্ষায় পাবনা যাওয়ার ডাক আসে চিঠিতে। আমি কবিতায় সাড়া দিই–

প্রথম ভ্রমণে সবই ভালো লাগে, শাদামাটা চায়ের দোকানও
তাই বলি, কোথাও একবারই যাওয়া ভালো
পুনর্বার গেলে রেলকলোনির বাঁকে
দেখতে পাব না সেই কেয়াগাছটাকে।

সেই কবে একবারই কোঠাবাড়ি গেছি
মেদিনিপুরেও সেই একবারই; মঞ্জুষের সাথে
একবারই শ্রীগুরুচরণে
শ্রদ্ধা জানাতে গেছি শান্তিনিকেতনে

অথচ তোমার ডাকে আজও সেই প্রথমেই ভয় :
একবার গেলে যদি বার-বার যেতে ইচ্ছে হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাকী জীবন হাঁটি আমি আর আমার কবিতা

বাঁকুড়ার কুমোরপাড়ার ছেলে রামকিঙ্কর দেশের বাইরে না-গিয়েও জগৎবিখ্যাত হয়েছেন। সমরেশ বসুর শেষ উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে* মহান এই বাঙালি ভাস্করকে নিয়ে লেখা। পাতায়-পাতায় বিকাশ ভট্টাচার্যর জলরঙে আঁকা ছবি। শেষ করে যেতে পারেননি সমরেশ এই উপন্যাস। তার আগেই মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জীবনের হাত থেকে। তাতে কী? শিল্পসাহিত্যে কোনও শেষকথা নেই। শুরু নেই তার, শেষও নেই কোনও। কিন্তু খ্যাতির শুরু ও শেষ দুটোই আছে। আজকের বিখ্যাত তসলিমাকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ইতিহাস বাঁকুড়ার কুমোরপাড়ার ছেলেটির মতো কোনও অখ্যাতকে তুলে নিয়েও চিরকালের সভায় বসাতে পারে। দুর্গাপ্রতিমার চক্ষুদান করা শিখেছিলেন রামকিঙ্কর তার গুরু জয়ন্ত জ্যাঠার কাছে। রামকিঙ্করের গড়া মূর্তি দেখলে আজ আমাদেরও চক্ষুযোগ ঘটে। একবারই শান্তিনিকেতনে গিয়েছি জীবনে। এখনও চোখে গেঁথে আছে রামকিঙ্করের কাজ। খ্যাতির পেছনে ছুটোছুটি করেননি রামকিঙ্কর; নিরন্তর কাজ করে গেছেন। 'কাজ করো– কাজ, কাজ আর কাজ'– ভাস্কর রঁদ্যাও এই কথা বলেছিলেন রিলকেকে। রঁদ্যার 'চিন্তাশীল মানুষে'র মতো রামকিঙ্করের 'সুজাতা' বা 'সাঁওতাল রমণী' বা 'গান্ধীমূর্তি'ও শিল্পের সভায় মহার্ঘের আসন পেয়েছে। খ্যাতির পেছনে ছোটেননি বলে খ্যাতিই রামকিঙ্করের পেছনে ছুটে এসেছে। অথচ একসময় রঙ-তুলি কেনারও পয়সা ছিল না এই জাতশিল্পীর। পুকুর-পাড়ের মাটি দিয়ে ছবিতে রঙের কাজ সেরেছেন। জয়ন্ত জ্যাঠার সঙ্গে শুশুনিয়া পাহাড়ে গিয়ে নিয়ে এসেছেন কল্লাচ পাথর। সেই পাথর-ঘষা রঙে শান্তিনিকেতনের রুদ্র পলাশের ছবি এঁকেছেন। সেই রঙের আগুনে নন্দলাল বসুর চোখ বিস্ময়ে ঝলসে গেছে। কি সাবলীল রামকিঙ্কর বলতে পারতেন– "আমার মনে হয়, ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ। অহেতুক কোন পাবলিসিটির চিন্তা না করলেও চলবে।" কী আত্মবিশ্বাস নিয়েই না উচ্চারণ করতেন– "বিদেশ গিয়ে শিখবই বা কী? ওদের সব কিছু খবর তো এখানে বসেই পাওয়া যায়। আর ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া? সে তো নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলেমের প্রশ্ন। তার জন্য অত দরজায়-দরজায় ভিক্ষে করা কেন? অনেকেই যান অবশ্য। বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করে সেই তো ফিরে আসতে হয় এই দেশে। অবন ঠাকুর বিদেশ যাননি। যামিনী রায় যাননি। শুনেছি বড়ে গোলাম আলিরও সেই এক ব্যাপার।"

আর আমাদের জয়নুল আবেদিন? শৈশবে বাবার পাশে বসে দড়ি পাকিয়েছেন অনেক। দড়ি পাকাতে-পাকাতে জয়নুলের হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ছেলেবেলাতেই। তাই তার তুলির দাগ এত মোটা। মোটা দাগেই জয়নুল মানুষের সূক্ষ্ম বোধে ঝড় তুলেছেন। তার 'দুর্ভিক্ষের কাক', 'গুণটানা মানুষ' আর 'লড়াকু ষাঁড়ে' ভাটির দেশের চিরকালের গল্প মিশে আছে। আরও আছে, নদী আর নদীতীরবর্তী জনপদের হাজার বছরের কান্না। সেখানে যে খালি-পায়ে না-গিয়েছে, নামের খ্যাতি তার দূরস্থায়ী হয়নি। জয়নুল তার ছাত্রদের বলতেন, 'নদী আমার মাস্টার মশাই।' সেই নদী আমারও আশ্রয়। তার পাশে নৌকা আমার বাহন। গাছ আমার শিক্ষক। অতএব মহাজীবনের পাঠ নিতে আমি আমি নিত্যই ঢাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ঢাকার বায়ুদূষণ, মানবদূষণ, রাজনীতিদূষণ, স্বার্থদূষণ ছেড়ে মাঝে-মধ্যেই দূরে কোথাও চলে না-গেলে আমি বাঁচি না।

ময়মনসিংহের হিন্দুপল্লীতে যতীন সরকারের বাড়ি। যতীন সরকারকে কোনও ধর্মপল্লীতে মানায় না। তবে মহল্লার এই নামকরণের সঙ্গে যতীন সরকারের চিন্তাচেতনার কোনও সম্পর্ক নেই। তার মতো মুক্তমনা মানুষ আমি কমই দেখেছি। যতীন সরকারের বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরই আমার মেনচি নানীর বাড়ি। আমার মায়ের ছোটখালা এই মেনচি নানী। মেডিকেলে পড়ার সময় কয়েক মাস আমি এই বাড়িতেই ছিলাম। নানী এখনও বেঁচে আছেন। হাতের হরলিক্সের কৌটা বিছানায় রেখে তার পা ছুঁয়ে সালাম করলে আমার ধর্মপালন করা হয় না; একজন স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধাকে খুশি করা হয়। অনেকদিন পর নানীর সঙ্গে দ্যাখা হওয়ায় আমি তার পা ছুঁয়ে সালাম করি।

কিছুদিন আগে আজিজ মার্কেটের তিনতলায় যতীন সরকারকেও করেছি– *বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের* ঘর-বারান্দায়। অধ্যাপক-অনুবাদক মোজাফফর হোসেন এই মুক্তসংস্কার সংগঠনটির সভাপতি। ঐদিন আমার একটা লেকচার-সেশন ছিল কবিতা ও উত্তরআধুনিকতার সম্পর্ক-অসম্পর্ক নিয়ে। যতীন সরকার পত্রিকা-মারফত খবরটা পেয়ে আজিজ মার্কেটে হাজির। আরও হাজির ছিলেন মেজর ফরিদ আহমদ ভূইয়া। আমার দ্যাখা সবচেয়ে নিবিড় পাঠক। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি থেকে শুরু করে এমন কোনও বিষয় নেই– যা তার পাঠাভ্যাসের বাইরে। চমৎকার বেহালাও বাজান। গুরু ফরিদ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে আছেন। এরশাদকে ইঙ্গিত করে মোহাম্মদ রফিক 'সব শালা কবি হবে...' লিখলে, কবিকে ক্যান্টনমেন্টে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এই গুরু ফরিদই জেরা করেছিলেন। জেরা বলা উচিত হবে না। সেটা ছিল কবিতা নিয়ে এক জম্পেস আড্ডা। মোহাম্মদ রফিকের কাছেই শোনা। পরে গুরু ফরিদের মুখ থেকেও শুনেছি। গুরু ফরিদ আমার কবিতার ভক্ত। আমার কবিতার অনেক-অনেক পঙ্‌ক্তিই তার মুখস্থ। যতিন সরকারকে যেমন ধর্মপল্লীতে, গুরু ফরিদকেও তেমনই যোদ্ধার সাজে মানায় না। তবু কত কী অর্ধসত্য দিয়ে বোনা আমাদের প্রতিদিনের জীবন।

ছেলেবেলার সেই রাশান সাইকেল নেই; তবু ব্রহ্মপুত্রের উদ্দেশ্যে হিন্দুপল্লী থেকে রিকশায় উঠি। পেছনে, যশ, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তি আমাকে ডাকে। আমি সাড়া দিই না। তাড়া করে অযোগ্যের আস্ফালন, প্রচারলিপ্সুর আক্রমণ আর উপকৃতের কৃতঘ্নতা– শঙ্খ ঘোষ একদিন তার চিঠিতে যে-কথা লিখেছিলেন। তোয়াক্কা করি না সেসবেরও। অনেক অভাব আর সংকটে পড়ে-পড়ে আমি জেনেছি, মানুষ মূলত একা। আত্মহত্যা করার মতো চরম দুর্দিনে আমি কবিতার খাতায় লিখেছি–

> আমার অভাব ভালো, বিপদে সুহৃদ নেই কোনও। কবিতার খাতা আছে আর আছে পূর্ণ অবসর। এখানে অভাবী মনে অনেক হেমন্ত লেখে নাম। অনেক কবিতা আসে, কেউ নয় খ্যাতির কাঙাল। তোমাদের সবই আছে; আমার ভাঁড়ার ভরা নদী। সে-নদী কালের জলে ভাটির দেশের ছবি আঁকে। আমার অভাব ভালো, সে আমাকে দিয়েছে বিজন। বিজনের পাড়ে বসে জলরঙে কত মুখ আঁকি। অভাবে স্বভাব নষ্ট না-হলে কে নিজেকে চিনেছে? আমার অভাব ভালো, অভাবের একাকীত্ব ভালো। কবিতাকে সাক্ষী রেখে সে-অভাব জীবন চেনাল।

জীবনে আমি যতবারই অভাবে পড়েছি, বন্ধু-সুহৃদরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। একজনই বন্ধু আজও আমাকে ছেড়ে যায়নি। মনিরা কায়েস। সেই ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে তাকে আমি লেখার মাধ্যমে চিনি। একসঙ্গেই আমাদের সাহিত্যচর্চার শুরু। তারপর ১৯৮৩ সালে বিয়ে। 'বিবাহ'টা প্রকরণমাত্র আমার কাছে। মনিরা এখনও আমার কাছে সেই প্রাকবিবাহ বন্ধুই। তার ছোটগল্পের আমি ভক্ত। আমি একা নই, ওর গল্পের আরও কেউ-কেউ অনুরাগীকে আমি চিনি। কলকাতার ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়সহ অনেকেই তার গল্পের পাগল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও তার গল্পের প্রশংসা করে লিখেছেন। কলকাতার প্রয়াত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ক্ষুদিরাম দাস তার *রবীন্দ্রকল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার* বইটি উৎসর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন মনিরাকে। মৃত্যুর আগে বাংলাদেশের সিকদার আমিনুল হক আর শাকের চৌধুরীরও ইচ্ছে ছিল মনিরার গল্প নিয়ে লেখার। *অমিত্রাক্ষরের* সুলতান সে-দুটি লেখা ছাপাতে চেয়েছিল। তাদের লেখা ছাপাতে না-পেরে আমাকেই অনুরোধ করেছিল সেই লেখা লিখতে। আমি অস্বস্তিতে পড়ে বলেছিলাম– "নিশ্চয়ই লিখব একদিন; তবে আজ নয়।" কত-কত জনকে নিয়ে লিখলেও মনিরার ছোটগল্প নিয়ে আমার সেই লেখা আজও হয়ে ওঠেনি। সেই মনিরা আমার কবিতা দিয়েই আমাকে ধরে রাখে; বলে–

যেতে চাও যাবে
আকাশও দিগন্তে বাঁধা, কোথায় পালাবে?

মায়ের পর এই মনিরার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছি জীবনে। তার সঙ্গে এক অতলস্পর্শী সম্পর্কে জড়িয়ে আছি সিকি শতাব্দিকাল। কিন্তু নদী যখন ডাকে, মনিরাকেও আমার মনে থাকে না। শুধু অস্পষ্ট একটা মুখ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছড়িয়ে যায় বোধে। সে-মুখ আমার মেয়ের। নদীর মতোই অথই।

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে রিকশা থেকে নামি। নদীপাড়ের আগের সেই নির্জনতা নেই। তবু একটা আড়াল খুঁজে বের করি। বড় প্রিয় ছিল এই নদী আমার ছেলেবেলায়। যদিও ব্রহ্মপুত্র নদী নয়– নদ। *মহাভারতে* তাকে পুরুষ হিসেবে দ্যাখানো হয়েছে। তাতে কি? আমার 'নদী' বলতেই ভালো লাগে ব্রহ্মপুত্রকে। নদীপাড়ের মানুষও 'নদ' কে 'নদী'ই বলে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আমার বাবা আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ক্লাস এইটে উঠলে বাবা আমাকে একটা রাশান সাইকেল উপহার দেন। সেই সাইকেল ছুটিয়ে আমি প্রতিদিনই ব্রহ্মপুত্রকে ছুঁয়ে আসতাম একবার। আমার জীবনের বিশ্বস্ততম বন্ধু জম্বু কলেজ রোডের শেষমাথা পর্যন্ত আমার পিছু নিত। তারপর লেজ নাড়িয়ে বিদায় জানাত। আমি সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটে যেতাম সার্কিট হাউসের দিকে। লালইটের সার্কিট হাউসকে বাঁয়ে রেখে উঠে পড়তাম ব্রহ্মপুত্র বরাবর টানারাস্তায়। সেই রাস্তা শম্ভুগঞ্জ গুদারা ঘাট পর্যন্ত চলে গেছে। একাত্তরে এই গুদারা ঘাট হয়েই আমরা গ্রামে পালিয়েছিলাম। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার অদূরসম্পর্কের নানা, ছাত্র লীগের মুজিবুর রহমান ফকির আপন মামা, আওয়ামী লীগের রাফিয়া আখতার ডলি মায়ের খালাতো বোন, আমার বাবা মুক্তিকামী ছেলেদের হাতে ইওটিসির রাইফেল তুলে দিয়েছেন– অতএব মৃত্যুও আমাদের পেছনে তাড়া করে পুরোটা একাত্তর।

কিন্তু আমি যখন রাশান সাইকেলে, বাংলাদেশ তখন স্বাধীন। অতএব আমাকে কে পায়? ডানে 'মহারাজার বাড়ি'খ্যাত আলেকজান্ডার ক্যাসেল। আমি ব্রহ্মপুত্রকে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

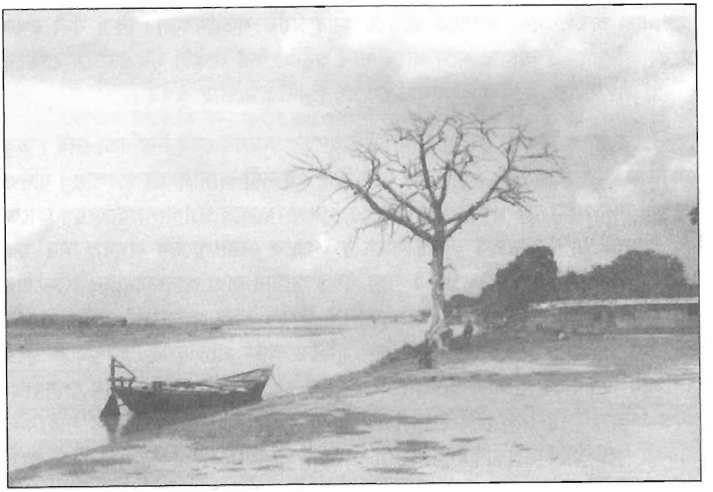

আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল পথ...পথের পাশে নদী...নদীর পাশে নৌকাবাঁধা ঘাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে বাতাস কেটে ছুটছি আমার পক্ষিরাজ সাইকেলে। অনেক পরে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ* পড়ে জেনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন ময়মনসিংহে আসেন, তখন এই ক্যাসেলেই উঠেছিলেন। রেলস্টেশনে মহারাজা বাহাদুর নিজেই গিয়েছিলেন কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে। সন্ধ্যায় পৌর মিলায়তনে সংবর্ধনার জবাবে দেওয়া ভাষণে কবি বলেছিলেন– "আজকালকার এই রেলওয়ে এবং দ্রুত যানবাহনের দিনে প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এই তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়িতে ভালবাসা বলিয়া যে জিনিস, তাহা এখন সঙ্কুচিত হইতেছে।" ১৯২৬ সালের ১৬ তারিখের কথা। শামসুর রাহমানের জন্মেরও আগের ঘটনা। তারপর সেই রেলগাড়ি আরও দ্রুত হয়েছে। হুড়োহুড়ি অনেক বেড়েছে। আজকের সাইবার যুগে কম্পিউটারের মাউসে ক্লিক করেই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে মানুষ। দূরের সম্পর্ক বাড়লেও কাছের আত্মীয়তাগুলো আর নেই। রাশান সাইকেলের রডে ছোটবোন মুন্নীকেও তুলে নিতাম কত-কত দিন। আমার কাছে নদী আর প্রকৃতিই তখন বড় শিক্ষক। আজও। সেই নদীর টানেই আবার ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এসে দাঁড়াই। খানিক আগেই সূর্য ডুব দিয়েছে এই নদীর জলে। ছেলেবেলার সেই রাশান সাইকেল নেই। সোনার হরিণের খোঁজে মুন্নীও সপরিবারে দেশ ছেড়েছে। বিশ্বস্ত সেই বন্ধু-কুকুরটিও নেই বলে পেছনে তাড়া করে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, প্রগতিসহ আরও কত কী। আমি সব রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নদীর পাশে একা। বাংলা আমার হাজার বছরের ইতিহাস। কিন্তু নদী লক্ষ বছরের প্রাচীন। নদীর পাশে দাঁড়ালে আমি আমার অতিপ্রিয় বাঙালি পরিচয়টিও ভুলে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠি। নদীর পাশে দাঁড়ালে আমার মানুষ পরিচয়ও মুছে যায়– আমি জগতের সামষ্টিক প্রাণসত্তার ক্ষুদ্র একক হয়ে উঠি। নদীর পাশে দাঁড়ালে আমিও ওডিসিয়াসের মতোই 'কেউ না'। নদীর পাশে দাঁড়ালে আমি পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে একা–

আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল পথ
পথের পাশে নদী
নদীর পাশে নৌকাবাঁধা ঘাট
ঘাটের পাশে শেষপাড়ানির কড়ি
গাছঠাকুরের পুজো
দাঁড়িয়ে ছিল হাজার অমারাত
দেউটি হাতে একলা মাঠের চাঁদ
দূরে কোথাও বৃষ্টিভেজা ঘর
টিনের চালে বিঠোফেনের চিঠি
কোথাও একটা জানলা খুলে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও একটা কাঁকনপরা হাত
কোথাও একটা উড়ে যাবার সাধ
দাঁড়িয়ে ছিল কেমন-করা মন
মনের তলে মনের তলদেশ
তার অতলে হঠাৎ কারও মুখ
হঠাৎ কারও রাত্রিচেরা ডাক
হঠাৎ কোনও নারিকেলের পাতা
ঠাণ্ডা-লাগা একজোড়া টনসিল
দাঁড়িয়ে ছিল ভুবনজোড়া মায়া
অষ্টরাণীর মৃত স্বামীর ছবি
শাদা ফ্রকের রিবন-বাঁধা চুল
কোল-বদলের ধূসর ছেলেবেলা
অতীত-করা হাজার গতকাল
আষাঢ়-করা শ্রাবণ-করা মন

আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল পথ
পথের পাশে নদী
নদীর পাশে মানুষ কেন একা?

মানুষ কেন একা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~